ওরাওঁ ছেলে
বুধন

ওরাওঁ ছেলে বুধন

প্রেমাংশু বশিষ্ঠ

মালা পাবলিকেশনস্
৫১, কালিনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা—৭০০০৩৬

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প একটি প্রধান সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্য দিয়ে সেই সম্পদ-সৃষ্টির ধারা আজও প্রবহমান। এই ধারার মধ্যে আছে বিচিত্র জাতের বিভিন্ন বিষয়ের সব অনবদ্য গল্প রাজি। সেখানে যেন পারিবারিক, সামাজিক জীবনের নানা সমস্যা ও ঘটনা মূলক গল্পও যেমন আছে, ঠিক তেমনি হাসির গল্প, ভূতের গল্প, রহস্য-রোমাঞ্চ মূলক গল্পও প্রভূত পরিমানে বিদ্যমান। এই সব ছোট গল্পের মধ্যে কিশোর বালকদের উপযোগী বিচিত্র বিষয়ের ও ঘটনার উপর লেখা গল্পগুলি বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

শ্রীপ্রেমাংশু বশিষ্ঠ একজন বিশিষ্ট গল্পকার। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা বিচিত্র বিষয়ের উপর নানা গল্প প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে মালা পাবলিকেশন্স্ থেকে প্রকাশিত তাঁর গল্পের সংকলনটি একটি বিশিষ্ট মর্যাদার দাবী রাখে, কারণ এই সংকলনটিতে কিশোরদের উপযোগী করে লেখা গল্পগুলির মধ্যে গ্রাম-ভারতের আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির একটি পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। ইদানিংকালে বাংলা ছোট গল্পের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পটভূমিকা রচিত হয় কলকাতা ও চার পাশের শহর ও শহরতলিতে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের লেখক পায়ে পায়ে কলকাতা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছেন বহুদূরে বাংলা বিহারের আদিবাসী গ্রাম, শাল মহুয়ায় ঘেরা আদিবাসী মানুষের কুটিরের ধারে। সেখান থেকে তিনি জীবনকে দেখেছেন অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে, রচনা করেছেন সেই খেটে খাওয়া নিপীড়িত মানুষের দৈনন্দিন জীবন যন্ত্রনার চিত্র। গল্পগুলির মধ্যে কেবল ছোটদের মনের খোরাক মেটে না, বড়দেরও ভাল লাগে। সহজ সরল ভাষায় এই সব ম্লান মূক মানুষের একটি বাস্তব রেখাচিত্র অঙ্কণ করেছেন অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে। এজন্য তিনি সকলের

ধন্যবাদের পাত্র। এছাড়া এই সংকলনটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছু রহস্য রোমাঞ্চমূলক গল্প—যা পাঠকের কাছে অতিরিক্ত পাওনা হিসাবেই গৃহীত হবে।

সংকলনটির প্রচার ও পাঠকদের সহানাভূতি কামনা করি। শ্রীপ্রেমাংশু বশিষ্ঠ-এর গল্পের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক।

সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এবং

সচিব, কলা ও বাণিজ্য বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

ওঁরাও ছেলে বুধন

ওরাওঁ ছেলে বুধন

শরতের রোদ্দুরে চুটিয়া গ্রামের মাটির কুঁড়েঘর আর মেঠোপথ ঝলমল করছে। রাঁচি জেলার এই ছোট্ট অখ্যাত গ্রামে প্রকৃতি তার অফুরন্ত সৌন্দর্য যেন উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। উঁচু-নিচু পাহাড়ি জমির মধ্যে সবুজ ঘাস। দূরে সারি সারি পাহাড়।

প্রতিদিনের মতো আজও পুবের আকাশে লাল করে সূর্য উঠেছিল আর কঁ কঁ করে ডেকে উঠেছিল মোরগ। বুধন ঘুম থেকে উঠে মনিবের গরু-ছাগলকে জাবনা দিল। বুধনের বাবাও গোরুর দুধ দুইতে শুরু করল। দুধ দুয়ে আজ সে খুব খুশি, কারণ অন্যদিনের তুলনায় আজ অনেক বেশি দুধ পেয়েছে সে। ছেলের পিঠ চাপড়ে সে বলল, "বুধন, বর্ষায় ঘাসগুলো খুব তাজা হয়েছে, না রে? এই ঘাস খেয়েই গোরুগুলো ভাল দুধ দিচ্ছে। মনিব আজ আমাদের ওপর খুব খুশি হবে।"

দুধ দেখে বুধনেরও খুব আনন্দ। সে গামছায় মুড়ি বেঁধে হাতে একটা বাঁশের বাঁশি নিয়ে দূরে মাঠের দিকে চলে গেল।

মুড়ির সঙ্গে লুকিয়ে গামছার মধ্যে করে নিয়ে যায় সে তার অতি আদরের বাঁশিটা। বুধনেব বয়স মাত্র দশ বছর। সারাদিন তাকে মাঠে মাঠে গোরু চরাতে হয়। সন্ধের সময় ঘরে ফিরেও তার ছুটি নেই। মনিবের গা টিপে দিতে হয়, মনিবের ছেলে আর বৌয়ের ফাই ফরমাস খাটতে হয়—এ রকম অনেক কিছু করতে হয়।

গোরু-বাছুরের কাজ করতে অবশ্য বুধনের ভালই লাগে। কারণ এরা তার সঙ্গী। বাছুরেরা ওর সঙ্গে দুষ্টুমি করলে রাগে দু'চার ঘা বসিয়ে দেয়, কিন্তু তারা ওকে কিছু বলে না, গুঁতিয়েও

দেয় না, বরং অনেক সময় তারা ছোট-ছোট শিং দিয়ে বুধনের পিঠ চুলকে দেয়। মাঠে যখন সে একা-একা বাঁশি বাজায়, এরা তখন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশি শোনে। গোরু-বাছুররাই তার সারাদিনের সবচেয়ে ভাল বন্ধু।

কিন্তু মনিবের কাছে যেতেই বুধনে ভয় লাগে। ইয়া মোটা গোঁফ তার, চোখ পাকিয়ে এমন করে বুধনকে নানারকম কাজ করতে বলে যে, মনিবকে দেখলেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

গাছতলায় বসে বুধন যখন মনিবের গোরুগুলোকে পাহারা দেয়, তখন দেখতে পায় তার বয়সী কত ছেলে-মেয়ে হাতে বইখাতা কাঁধে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, তাদের অনেকেই বুধনের মতো অদিবাসী। তারও ইচ্ছে করে সে স্কুলে যাবে, বই পড়বে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করবে। কিন্তু সেই সুযোগ তার নেই। তার মনিব, তার বাবারও মনিব, রামদেও সিংয়ের কড়া হুকুম—স্কুলে যাওয়া চলবে না। লেখাপড়া করলে কাজ করবে কে ? ওসব ভদ্রলোকদের জন্যে।

নিজের দুঃখের কথা চিন্তা করে যখন কান্না পায়, তখনই সে বাঁশি বাজায়। চোখ বন্ধ করে বিভোর হয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে সব দুঃখ সে ভুলে যায়। মেলা থেকে তার বাবা তাকে এই বাঁশি কিনে দিয়েছিল।

মাঠের শেষে যে আদিবাসী স্কুল আছে, সেই স্কুলের এক মাস্টার-মশাই হরিকান্ত ত্রিপাঠী প্রতিদিনই দেখেন মিষ্টি চেহারার এই আদিবাসী ছেলেটিকে। একদিন বাঁশি শুনে নিজেই তিনি বুধনের সঙ্গে আলাপ করলেন। বললেন, "চল্ না, আমার ইস্কুলে পড়বে ?"

বুধনের খুব আনন্দ হয়েছিল মাস্টারজির এই কথা শুনে। বলেছিল "কেন পড়ব না ? নিশ্চয় পড়ব। বাবাকে বলে আপনার ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যাব।"

বুধন সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে বাবাকে বলল, "বাবা, আমায় ইস্কুলে ভর্তি করে দাও, মাস্টারজি বলেছে।" বলেই দেখল, ওর

বাবার দুটো চোখ জলে ভর্তি হয়ে গেছে। বুধনের বাবা বলল, "তুই ইস্কুলে ভর্তি হলে আমাদের মনিব যে আমাদের তাড়িয়ে দেবে। কী খাব তখন আমরা?"

"কেন? তুমি লোকের খেতিতে কাজ করবে, খাটিয়া বানিয়ে বিক্রি করবে।"

খেতিতে কাজ করার কথা শুনে বুকটা ধক্ করে উঠল বুধনের বাবার। কী বোঝাবে সে তার ছেলেকে?

মুণ্ডা, ওরাওঁ, বীরহোর, সাঁওতাল, এইসব আদিবাসীরা আগে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা আর সিংভূম এলাকার জঙ্গলে বাস করত। জঙ্গলের মাঝে-মাঝে ছিল আদিবাসী গ্রাম। সেখানে উঁচু নিচু, ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ ছিল না। সর্দারের কথামতো তারা চলত। জঙ্গল ছিল তাদের নিজেদের। তারা জঙ্গলের কাঠ কাটত, মাঠে ফসল ফলাত, একসঙ্গে শিকার করত। সকলে যে যা পেত তা মিলে ভাগ করে খেত। বুধনের বাবা শুনেছে, সভ্য মানুষগুলো এসেই তাদের একসঙ্গে থাকার আনন্দ নষ্ট করেছে।

ইংরেজরা জমিদার বসিয়েছে তাদের ওপরে। পাথুরে জমিতে ফসল যেটুকু ফলাত, তার বেশিটাই নিয়ে নিত জমিদাররা। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে বছরের খোরাকও চাষিরা যোগাড় করতে পারত না। খাজনা দিতে না পারলে প্রায়ই জমিদারদের লেঠেলরা তাদের মারধোর করত। এইভাবেই তারা দলে দলে সুন্দর প্রকৃতির কোল ছেড়ে দু' মুঠো অন্নের জন্য এদিক ওদিক ছড়িয়ে গেছে। কুলি-মজুরের কাজ করার জন্য তারা শহরের দিকে পা বাড়িয়েছে। এ-সমস্ত কথা বুধনের বাবা শুনেছে তার বাবা আর ঠাকুদার মুখ থেকে। কিন্তু যেটুকু সরল সুন্দর জীবন ছোট বয়সে সে দেখেছে, আজ সেটুকুও সে দেখতে পায় না। এখনও মুণ্ডা, ওরাওঁদের পল্লীতে রাত্রিবেলা বাঁশি বাজে, মাদল বাজে, কিন্তু সেই আনন্দ কি তারা পায়, যা আগে পেত?

বুধনের বাবার ঘর ছিল হাতিয়ায়। একদিন তাদের গ্রামের লোকেরা দেখল গাড়ি করে লোক এল। পরে দেখল, গ্রামে আরও লোকজন আসছে। জিজ্ঞাসা করে তারা জানল, হাতিয়ায় কারখানা হবে। সকলকে বলা হল, "তোমাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।" গ্রামবাসীদের বুকে ধক্ করে আগুন জ্বলে উঠল। সর্দার বলল, "জমি আমরা ছাড়ব না।" বুধনের বাবাও বলেছিল, "জমি ছাড়ব না।"

কারখানার লোকেরা বোঝাল, "তোমাদের সকলকে বেশি মাইনের চাকরি দেব আমরা, তোমাদের আর কষ্ট থাকবে না।" অনেকে চাকরির আশায় জমি ছাড়ল। যারা জমি ছাড়তে চায়নি, পুলিশ তাদের হটিয়ে দিল। বুধনের বাবা পুলিশের মার খেয়ে বাড়ি ছাড়ার পর অনেক খুঁজেপেতে রামদেও সিংয়ের বাড়িতে কাজ পেয়েছে।

বুধনের বাবা বলল, "না রে বুধন, তোর লেখাপড়া হবে না। মনিবের কাছে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়েছিলুম, সে টাকা আজও শোধ করতে পারিনি। তোর মায়ের অসুখের সময় সিংজি আমাকে সে টাকা দিয়েছিল। এখন এত টাকা সুদ হয়ে গেছে···"

আর বলতে পারল না সে, গলার মধ্যে বাকি কথা আটকে গেল।

"কী হয়েছে বাবা, আর বলছ না কেন ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বুধনের বাবা বলল, "মনিব বলেছে ও টাকা আর শুধতে হবে না, কিন্তু সারা জীবন কাজ করে দিতে হবে।"

বুধন এ-কথা শুনে কেঁদে ফেলল। সে বুঝে গেল যে, বাবার মতো তাকেও সারা জীবন ওই গোঁফওলার চোখ-রাঙানি সহ্য করতে হবে। লেখাপড়াও শিখতে পারবে না, নিজের ঘরেও থাকতে পারবে না। বুধন কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে বলল, "চলো রাতের বেলা বাপ-বেটায় পালিয়ে যাই। কেউ টের পাবে না। এখানে থাকব না আমি।"

বুধনের বাবা ছেলের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত করতে লাগল। অনেক বোঝাল ছেলেকে "ওরে, ভগবানকে ডাক, তিনি

আমাদের সব দুঃখ দূর করে দেবেন। আমরা বোকা আদিবাসী। আমরা সিংজির নজর এড়িয়ে পালাতে গিয়ে ঠিক ধরা পড়ে যাব।"

"আমরা টাটানগরে চলে যাব। সিংজি আমাদের খুঁজে পাবে না। চলো বাবা। চলো না বাবা টাটানগরের।"

"যা বুধন, ঘুমুতে যা, মাথা গরম করিস না। কাল সকালে আবার তোকে গোরু চরাতে যেতে হবে।"

বুধন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ডাল দিয়ে রুটি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিনের মতো বুধন গোয়ালে গেল, গোরুর জাবনা দিতে। গিয়ে দেখল তার বাবা জাবনা দিয়ে দিয়েছে। ছেলেকে দেখতে পেয়ে বুধনের বাবা বলল, "আজ থেকে আর তোকে গোরুর জাবানা দিতে হবে না আমিই দেব। যা, দাঁতন করে মুড়ি বেঁধে নে।"

নিমগাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বুধনের মনে হল, বাবা বোধহয় ওর ওপর রেগে গেছে। সে আর কোনো কথা না বলে মুখ ধুয়ে মুড়ি বেঁধে গোরুর পাল নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল।

সেদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিন। স্কুল বন্ধ তাই কোনো ছেলেমেয়েকে সেদিন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যেতে দেখা গেল না। বুধন একা আপন মনে গাছের গোড়ায় বসে আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে চেঁচামেচির শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল, ওরই বয়সী অনেক ছেলে চাল, ডাল, আলু, কাঠ নিয়ে এসে চড়ুইভাতি করছে। ওদের সঙ্গে সেই মাস্টারজিও আছেন। হৈহৈ ব্যাপার! কেউ জল আনছে। কেউ বা উনুনের আগুনে কাঠ দিচ্ছে। চুপচাপ বসে বুধন এইসব কাণ্ড দেখছে এমন সময় মাস্টারজি এসে বললেন, "কী রে, আসবি আমাদের সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।" বলে বুধন কাজে লেগে গেল ওদের সঙ্গে। মনের আনন্দে বুধন তরকারি কুটল, কাঠের টুকরো উনুনে ঢোকাল, আরও কত কী করল।

বুধন যাদের সঙ্গে সমস্ত দিনটা কাটায়, সেই গোরু-বাছুরের দল বোধহয় কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ তারা বুধনকে কোনো দিন মাঠের মধ্যে এসব করতে দেখেনি। তারাও এদিক-ওদিক চরে বেড়িয়ে একে একে মাঠে এসে বুধনের চড়ুইভাতি করা দেখতে লাগল।

রান্নাবান্না শেষ হতে দিন গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। তারপর সকলে খেতে বসল মাঠের ওপর গোল হয়ে। বুধন গোরুদের বলল, "তোরা বসে থাক। আমাদের খাওয়া হয়ে গেলে কলাপাতা, শাল-পাতা পাবি।"

বুধনের ভাষা গোরু-বাছুর বোঝে। বুধনও তাদের ভাষা, তাদের সুখ দুঃখ বুঝতে পারে। বুধনের ওপর আজ গোরুদের খুব রাগ হল। ওরা ভাবল, বুধন তাদের সঙ্গ ছেড়ে অন্য সকলের সঙ্গে মিশছে। দু-একটা গোরু তো রাগে বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল।

কয়েকটা গোরু ঘরে ফিরে এল, অথচ বুধন ফিরল না দেখে বুধনের বাবার দুশ্চিন্তা হল। বুধনের মনিবও জিজ্ঞেস করল বুধনের বাবাকে, "বুধন ফিরল না কেন? ও মাঠে কী করছে?"

বুধনের বাবা আমতা আমতা করে বলল, "ছেলে বায়না করেছিল ইস্কুলে পড়বে। আমি বারণ করেছিলুম। সেই রাগে ও আজ ফিরল না কি না বুঝতে পারছি না।"

"কী? এত বড় সাহস হয়ে গেছে ওর!" বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল রামদেও সিং। "চল আমার সঙ্গে। তোর ছেলেকে আদর দিয়ে মাথায় চড়িয়ে দিয়েছিস, দেখি ও ফেরে কি না।" বুধনের বাবাকে নিয়ে সিংজি মাঠের দিকে এগোল। যে-কটা গোরু ফিরে

এসেছিল, ওদের পেছনে পেছনে তারাও আবার চলল মাঠের দিকে।

মাঠে পৌঁছে বুধনের বাবার মুখে হাসি ফুটল। ছেলে খুশি মনে অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে হাডুডু খেলছে দেখে মন আনন্দে ভরে গেল তার। কিন্তু রামদেও সিং দাঁতে দাঁত চেপে চেঁচিয়ে উঠল, "বুধন, তুই এদিকে আয়। খুব সাহস হয়ে গেছে তোর, না ?"

রামদেওয়ের চিৎকারে বুধনের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ভয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। যে-সব ছেলের সঙ্গে বুধন খেলছিল, তারা কিছু বুঝতে না পেরে, খেলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুধন দল থেকে বেরিয়ে মনিবের সামনে এসে দাঁড়াল। মাস্টারজি খাবার-দাবার খেয়ে দূরে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। রামদেও সিংয়ের চিৎকারে তিনি চমকে উঠে দেখলেন, মোটা একজন লোকের দিকে তাঁর স্কুলের ছেলের দল এগোচ্ছে। উনি ভাবলেন, ছেলেরা বোধহয় কোনোরকম দুষ্টুমি করেছে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে। সেই জন্যে তিনি 'কী হয়েছে, কী হয়েছে' বলতে বলতে তাড়াহুড়ো করে রামদেওয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। শুনলেন, বুধনকে রামদেও নানারকমভাবে শাসাচ্ছে।

দু' তিন মিনিটের মধ্যে মাস্টারজি বুঝতে পারলেন, ওই গোঁফওয়ালা লোকটা বুধনের মনিব। মাস্টারজি রামদেওকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "এইটুকু ছেলে ওকে এভাবে বকবেন না। ছোট ছোট ছেলেপুলেদের সঙ্গে মজা করে ফিস্টি করেছে, কোনো অন্যায় তো সে করেনি।"

রামদেও চড়া গলায় বলল, আলবত করেছে। ও আমার চাকর। আমারই কাজে ফাঁকি দিয়ে খেলা করবে ?"

"কেন, আপনার ছেলেমেয়েরা কি খেলে না ?"

"চুপ করুন। আমার ছেলে ওর মনিব। ছোটলোকদের মাথায় তুলবেন না বলছি।"

এই কথা শুনে মাস্টারজি খুব খেপে গেলেন। বললেন, "আপনি ছোটলোক, না হলে এত ভাল ছেলেকে ছোটলোক বলেন কী করে?"

মাস্টারজির কথা শুনে সব ছেলে হোহো করে হেসে উঠল। রামদেওয়ের মাথায় তাতে আগুন জ্বলে উঠল। সে বুধনের গালে ঠাস করে এক চড় মেরে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বলতে লাগল, "তোর জন্মেই আমার এত অপমান হল। আজ তোকে মেরে শেষ করে দেব।"

বুধনের বাবা অনেক সহ্য করেছে। কিন্তু আর সে নির্বাক দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। রামদেওয়ের হাত চেপে ধরল সে। আর তখনই ঘটল এক আশ্চর্য ব্যাপার। মুহূর্তের মধ্যে চারপাশ থেকে বুধনের আদরের গোরু-বাছুরের দল রামদেওকে শিং দিয়ে গুঁতোতে শুরু করে দিল। রামদেও মাটির ওপর পড়ে গেল। তার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত। যন্ত্রণায় সে চেঁচাতে লাগল, "বাঁচাও, বাঁচাও।"

বুধন এতক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। এইবারে সে গোরু-গুলোর সামনে এসে দাঁড়াল। দু' হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "থাম্, থাম তোরা। মনিবকে তোরা মারিস না। মনিবের ছেলে আছে। সে কাঁদবে। তার বাবাকে মারলে সে কাঁদবে। থাম তোরা, থাম।"

মাস্টারজি এসে জড়িয়ে ধরলেন বুধনকে। তারপর রামদেও সিংকে বললেন, "এই ছোটলোকের জন্মেই আপনি আজ বেঁচে গেলেন সিংজি। বুধন না বাঁচালে আপনার সমস্ত দম্ভ আজই শেষ হয়ে যেত।"

অনেক কষ্টে সিংজি যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে 'হামকো উঠাও, হামকো উঠাও' বলে হাতটা ওপর দিকে কিছুটা ওঠাল, সকলে সিংজিকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল।

বুধনের দিকে তাকিয়ে চোখ থেকে তার টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। সেই জলে যেন তার সারা জীবনের পাপ ধুয়ে মুছে যেতে লাগল!

সন্ধের অন্ধকার ভেদ করে লম্বা শাল গাছগুলোর পেছনে সোনার রঙের চাঁদ দেখা দিল। চারিদিক আলোয় ভেসে গেল।

নতুন দেশের মাটিতে

স্কুলে তখন চলছিল গরমের ছুটি। দুপুরে খেয়েদেয়ে পড়ার ঘরে ছুটির পড়া করছিল রবি। সকাল থেকেই লোড সেডিং চলছিল। ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে তবুও সে পড়ছিল। কারণ স্কুল খুলেই হাফইয়ার্লি পরীক্ষা। উপরন্তু সে পড়ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনী, উঠব উঠব করেও বিষয়ের টানে কিছুতেই সে পড়াটা ছেড়ে উঠে পড়তে পারছিল না।

পড়াটা শেষ করে চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে রবি চিন্তা করতে লাগল কলম্বাসের সঙ্গে সেও যেন পাল খাটানো জাহাজে চেপে সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেলে দুলে এগোচ্ছে। শুধু জল আর জল, ফুলে কেঁপে উঠা সমুদ্রের ঢেউ বহে নিয়ে চলেছে দুধের মত সাদা ফেনার রাশি! অনেক দূরে মেঘ ঠেকে গেছে জলের সীমানায়।

হঠাৎ ওর চিন্তার মধ্যে বাধা পড়ল। কে যেন মাথায় একটা টোককা দিল। চমকে তাকিয়ে ঘাড় ঘোরালো রবি।

"কী ভাবছিস রে রবি?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে সে দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন খুব ছোট আকারের এক বৃদ্ধ সন্যাসী! চার ফুটের মত তাঁর উচ্চতা। শীর্ণ দেহ, গলায় নানান রকমের মালা! আরো বিস্ময়কর হল সন্যাসীর দুটো চোখ! যেমন বড় তেমনই জ্বলজ্বলে! সন্ন্যাসী এক দৃষ্টে রবির দিকে তাকিয়ে বললেন, "নতুন নতুন দেশ দেখতে চাস তাই না?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু আপনি, কি করে তা জানলেন?"

"সব জানি আমি, ইচ্ছে করলেই তোর সব পেটের কথা ঝরঝর করে বলে যেতে পারি। তবে কলম্বাসের যুগ তো আর নেই যে সমুদ্র যাত্রা করে নতুন দেশের সন্ধান পাবি।"

রবি সন্ন্যাসীকে বলল, "আপনাকে দেখে আমার ভয়ানক ভয় করছে। আমি একটু ভেতরের ঘরে যাব।"

"ভয়ের কিছু নেই। আমি তোর মত ছেলেদের খুব ভালবাসি। একটা নতুন দেশে যাবি? সভ্যমানুষদের কেউ এখনও সেই দেশের সন্ধান পায়নি। যাবি?"

রবির শুকনো গলা থেকে উত্তর বেরল, "হ্যাঁ, কেমন করে···!"

"বেশ, তবে তোর আংটিটা দে।"

রবি তার আংটিটা খুলে সন্ন্যাসীকে দিল। সন্ন্যাসী সেটা তাঁর নিজের কপালে, গলার মালায় এবং বুকে ঠেকালেন, তারপর সেটা রবির হাতে দিয়ে বললেন, "মুঠোর মধ্যে এই আংটিটা নে, নিয়ে মুঠোর দিকে তাকিয়েই বল কালি, তারা, ব্রহ্মময়ী!

রবি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—কালি, তারা, ব্রহ্মময়ী ···। এখন রবির শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগল। মুঠো করা অবস্থায় সে অনুভব করতে লাগল আংটিটা আর তার মুঠোর মধ্যে নেই। তার বদলে মুঠোর মধ্যে ভারী একটা বস্তু! মুঠো খুলে দেখলে চেটোর মধ্যে রুপোর মোটামোটা একটা কবচ!

সামনের দিকে তাকাল রবি। কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথায় গেলেন? চারিদিকে তাকাল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আর কারোকে সে দেখতে পেল না, সে চিৎকার করার চেষ্টা করল। কিন্তু গলা থেকে কোন শব্দ বার হল না। ভয়ে সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল, অবশ হয়ে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

কোকিলের কুউউ কুউউ শব্দে রবি চোখ মেলে তাকাল। দেখল তার চারিদিকে লাল, নীল, হলদে, বেগুনী কত রকমের চোখ জুড়োনো ফুল ফুটে আছে। রঙ বেরঙের প্রজাপতি, ছোট বড় পাখী উড়ে

বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। রবির মনের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল! সে উঠে দাঁড়াল। দূরে উঁচু নীচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে নীল আর সবুজের পোচ লাগানো, পাহাড়ের পেছনে টকটকে লাল থালার মত সূর্য।

রবির মনে হল এটা নিশ্চয় ভূ-স্বর্গ অর্থাৎ কাশ্মীর, কাশ্মীরে রবি কোনদিন যায়নি, কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে বাবার কাছ থেকে অনেক কিছু শুনেছে। গল্পের বই, ভ্রমণের বই থেকেও সে অনেক কিছু জেনেছে। মনে মনে মিলিয়ে নিতে নিতে হঠাৎ তার মনে হল, কাশ্মীরে তো এখন যথেষ্ট ঠাণ্ডা, তাও আবার এই সাত সকালে। কিন্তু এখানে ঠাণ্ডা গরম কোনটাই তো বোধ হচ্ছে না? তবে কি···। সে যাই হোক, এ রকম সুন্দর জায়গায় কোনদিন আমি আসিনি।

বৃথা ভূগোলের চিন্তায় মাথাটা নষ্ট না করে রবি নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হাটতে লাগল। পায়ে ঠেকল লাল আর হলুদ মেশানো রঙের নিটোল একটা ফল। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল তার। মনের আনন্দে সে খেতে শুরু করে দিল, ওর মনে হল যত রকমের ভাল ভাল ফল সে খেয়েছে তাদের সকলের স্বাদ মিলে যেন এর স্বাদ তৈরী হয়েছে।

কিছুক্ষণ হেঁটে রবি একটা নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছল। নদীর জলের রঙ নীলাভ সবুজ! পাড়ের কাছে একটা রঙচঙে বজরা দেখতে পেয়ে ওর মন আনন্দে নেচে উঠল। বজরার ভেতরে কেউ আছে কি নেই ভাবছে এমন সময় ওর ভেতর থেকে দারুণ সুন্দর চেহারার একজন লোক বাইরে বেরিয়ে এল, লোকটা হাত নেড়ে রবিকে ডাকল।

"কী ভাই নতুন মানুষ, নৌকা চড়বে?"

"ইচ্ছে তো করছে, কিন্তু পকেটে যে পয়সা নেই।

"আমরা ছোটদের কাছ থেকে পয়সা নিই না। চলে এস।

রবি প্রায় দৌড়নোর মত করে বজরায় গিয়ে বসল, লোকটি গান গাইতে গাইতে হাল টানতে লাগল। এই লোকটি কিছুক্ষণ আগে বাংলা ভাষায় কথা বলেছে। কিন্তু এখন অজানা ভাষায় গান শুনতে শুনতে ফস্ করে রবি বলে উঠল, "এখানকার সব মানুষজনই কি আপনার মত সুন্দর দেখতে ?" গান থামিয়ে লোকটি মুচকি হাসল। বলল, "আরো অনেক কিছুই দেখতে পাবে এখানে। দেখার পর আমাকে বোল এখানে কোন জিনিসটা তোমার অসুন্দর ঠেকেছে।"

"মানে ? সব সুন্দর ! কিন্তু কি করে এটা সম্ভব ?"

"সব কিছু পরে জানতে পারবে।"

নদীর মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে রবির মনে হল এটা নিশ্চয় সত্যকারের স্বর্গ। কারণ স্বর্গ ভিন্ন সব সুন্দরের দেশ আর কোথায়ই বা থাকতে পারে ? যে বজরা চালাচ্ছে সে নিশ্চয় কোন দেবতা। অনেকক্ষণ চুপ থেকে রবি বলে ফেলল,

"এটা কি স্বর্গ ?"

"বলতে পার' তবে এই স্বর্গ আমরা নিজেরাই তৈরী করেছি।"

"তাও আবার হয় নাকি ?"

"হয়। মানুষ ইচ্ছে করলে সবই করতে পারে।"

বজরা চালক চুপচাপ আরো কিছুক্ষণ চালিয়ে বলল, "শুনেছি, বহুদিন আগে আমাদের পূর্বপুরুষ যাঁরা এখানে এসেছিলেন বা যাদের নিয়ে আসা হয়েছিল, সকলে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিল। সকলে নিশ্চয় সুন্দর দেখতে ছিলেন না, কিন্তু সুন্দর পরিবেশে থেকে রাগ, হিংসা মুক্ত হয়ে সকলে ধীরে ধীরে সুন্দর হয়ে গিয়েছিলেন।"

"আচ্ছা, আপনারা কি বাঙালী ?"

"আমরা সব কিছুই আবার কিছুই নয়। তবে আমরা বাংলা ভাষাকে সুন্দর বলে শিখে নিয়েছি।"

"এটা কি বাংলাদেশ ? মানে পদ্মাপারের দেশ ?"

এই প্রশ্ন শুনে বজরা চালক হো হো করে হেসে উঠল, "তুমি তো হে মোটেই বুদ্ধিমান ছেলে নও। তোমাদের পশ্চিমবঙ্গের মত বাংলা দেশেও অনেক গরীব মানুষ আছে আর আছে চারিদিকে গণ্ডগোল, হানাহানি। তোমাকে আমাদের রাজধানীতে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে দেখবে কলকাতা কিম্বা ঢাকার মত নোংড়া রাস্তাঘাট কোথাও নেই, না আছে লোকজনের ভীড়, হোই হট্টগোল, আর না আছে ট্রাম, বাস লরি, ট্যক্সির বিশ্রী আওয়াজ, এখানে সব কিছুর সঙ্গে একটা নিস্তব্ধতা আছে, সৌন্দর্য আছে।"

"তবে আপনাদের দেশের নাম কি ?"

"আমরা একে 'সুদেশ' বলি, পৃথিবীর লোক একে স্বপ্নের দেশ বলে।"

রবি মনে মনে ভাবতে লাগল, এখানেই সারা জীবন কাটিয়ে যাব। নিশ্চয় এখানে স্কুল কলেজ আছে। বাবা মাকেও নিয়ে আসব এখানে।

"কী হে, কী ভাবছ ? ওটি হবার নয়।"

চমকে উঠল রবি। কি হবার নয় বলছেন ? লোকটি বলল, "তোমরা সকলেই মন্দ, তোমাদের এখানে ঠাঁই নেই, তোমাকে এ রাজ্যের কিছুটা দেখিয়েই ফেরত পাঠিয়ে দেব।

ভীষণ কান্না পেল রবির। অন্তত একটি বারের জন্য মা বাবাকে দেখাতে পারব না ?

হলুদ রং এর পাথরে বাঁধান ঘাটে এসে বজরা থামল। এবার বজরা চালক বলল, "এটা আমাদের রাজঘাট, এখান থেকেই আমাদের ছোট রাজধানীর শুরু। সামনের দিকে হাঁট, তোমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাব।" রবির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আনন্দে এবং কিছুটা ভয়ে। জীবনে কোনদিন সে রাজা দেখেনি, কেবল ইতিহাসে তাদের কথা শুনেছে। গল্পে তাদের সম্বন্ধে জেনেছে। কথায় কথায় সাধারণ লোকের গলা কোতল করত, ঘোড়া হাতির পিঠে চেপে

যুদ্ধ করত এরকম কত রাজার কথা সে শুনেছে। আবার আকবর, হুসেন শাহের মত বাদশা সুলতানদের কথা সে শুনেছে। সে পড়েছে রামচন্দ্র, আশোকের মত মহৎ রাজার কথা। এই দেশের রাজা নিশ্চয় খুব মহৎ হবে।

বজরা চালকের সঙ্গে হাঁটবার সময় পথে কিছু মানুষজন দেখতে পেল রবি, তাদের কেউ কেউ থমকে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকাল, রবি বুঝতে পারল ওর মত ছেলেপুলে নিশ্চয় এখানে বিশেষ আসে না। রঙবেরঙের ফুল আর লতাপাতা দিয়ে সাজান একটা বাগান বাড়ীর গেট পার করে বজরা চালক রবিকে বলল, এইটাই রাজার বাড়ীর গেট। গেটে সে কোন বন্দুকধারী এমনকি ঢাল তলোয়ার ধারী প্রহরী দেখতে না পেয়ে বলল, 'আর যাই বলুন, এটা ঠিক রাজবাড়ী মানায় না, ইতিহাসে…'

'তুমি যা দেখছ সেটাই তো ইতিহাস, তবে নতুন ধরণের। এখানকার রাজা যে সকলের মনের রাজা, প্রাণের রাজা, তাঁর কোন শত্রু নেই, এখানে সকলেই তাঁর মিত্র।

এরপর তাকে একটা বড় ধরনের ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। সবুজ রঙের গালিচার ওপর দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখতে লাগল, তার সামনের দিকে কাঠের একটা সিংহাসন সে দেখতে পেল। ঘরের ডান পাশে আরো কয়েকজন মানুষ বসে আছেন। বুঝল এঁরাই তাঁর সভাসদ, রবি এদিক ওদিক তাকিয়ে সিংহাসনের সামনের দিকে বসল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুতি পাঞ্জাবী পরা দেব-কান্তি রাজা ঘরে ঢুকে সকলের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। রাজার পেছনে এসে দাঁড়ালেন সেই সন্ন্যাসী। "সন্ন্যাসী ঠাকুর"!—অস্ফুটস্বর বেরিয়ে এল রবির গলা থেকে।

সন্ন্যাসী রবির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইনি এ রাজ্যের রাজা। ইনি জ্ঞানী পুরুষ, এনাকে প্রণাম কর।"

প্রত্যুত্তরে রাজা বললেন, "নতুন অতিথিকে প্রণতি জানাই। তুমি ভালো হয়ে থাকবার চেষ্টা করবে। জানবে, চালাকি করে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।"

রাজা সভাসদদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। সারাদিন ঘুরে ঘুরে রবির শরীরে ক্লান্তি নেমে এসেছিল। নরম সবুজ গালিচায় বসে ওর ঝিমুনি এল। চোখ জড়িয়ে ঘুম নেমে এল।

দরজায় দুমদায় শব্দে রবির ঘুম ভেঙে গেল। খোল, দরজা খোল। দরজা খোল রবি। সন্ধ্যে হয়ে গেল এখনও ঘুমবি নাকি? উঠ।

নিজের গায়ে চিমটি কাটল রবি। হ্যাঁ আমি তো জেগেই আছি! কী রে বাবা এতক্ষণ···রবি চেয়ার থেকে উঠে দরজা খুলে দিল।

রবি মাকে সবকিছু খুলে বলল, যা যা ঘটেছে সবকিছু। মা তো হেসেই খুন। "হতেই পারে না। তুই স্বপ্ন দেখেছিস।" সে মাকে বারবার বলতে লাগল। দেখ না, হাতের আংটিটা আছে? কোথায় গেল সেটা? আর এই দেখ সেই কবচ যা সন্ন্যাসী ঠাকুর আমায় দিয়ে গেছেন।

হাসি থামিয়ে রবির মা গম্ভীর হলেন, সত্যি তো এই কবচটা এল কোথা থেকে!

বন্ধু

বোধানন্দ চট্টোপাধ্যায় রাচী ষ্টেশনে নেমে রিক্সায় উঠলেন। রিক্সায় চেপে খানিকটা পথ পার হয়ে তিনি বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বসন্তের সকাল! সোনালী রোদ পাহাড়ী গাছপালার কচি পাতায় লেগে ঝলমল করছে। দূরে আদিবাসী কৃষক সঙ্গে মোষ আর কাঁধে লাঙল নিয়ে চাষ করতে চলেছে। রাস্তার পাশ দিয়ে দলে দলে আদিবাসী মেয়েরা গান গাইতে গাইতে যে যার কাজে যাচ্ছে। বোধানন্দ মনকে পদ্মফুলের পাপড়ির মত মেলে ধরলেন প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যের মাঝে।

প্রাণভরে সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল রিক্সাচালকের দিকে। রাস্তা সামনে উঁচু হয়ে উঠেছে। তাই রিক্সাচালক রিক্সা থেকে নেমে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এখনও যথেষ্ট ঠাণ্ডা রয়েছে তার মধ্যে চালককে ঘেমে যেতে দেখে বোধানন্দবাবুর মনে খুব কষ্ট হল। উনি রিক্সা থেকে নেমে পড়লেন।

"কেয়া বাবুজী উৎরোলেন কেনো?" খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল রিক্সাচালক।

"রাস্তা উঁচু হয়ে যাচ্ছে বলে তোমার প্যাডেল করতে কষ্ট হচ্ছে তাই।"

"নেহি বাবুজী। পইসা দিয়ে কোষ্ট কোরবেন কেনো?"

"আরে ভাই পয়সা দিয়েছি বলে কী তোমার ফুসফুসটার ক্ষতি করার অধিকার আমার আছে? চল এগিয়ে চল।"

রিক্সাচালক গরীব মুণ্ডা। লেখাপড়া শেখেনি। সে শুধু খাটতে শিখেছে ছোট বয়েস থেকে। সে বোধানন্দবাবুর কথা

ঠিকমত বুঝতে পারল না। বারবার অনুরোধ করল রিক্সায় চেপে বসার জন্য। অবশেষে উনি ধমক দিয়ে রিক্সাচালককে অনুরোধ করা থেকে নিবৃত্ত করলেন।

চালক আবার রিক্সা টানতে লাগল। বোধানন্দবাবু পাশে পাশে চড়াই পথে হাঁটতে লাগলেন। পথে চলতে চলতে তিনি চালককে নানারকম প্রশ্ন করলেন, রিক্সাচালক খুশীমনে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল। এইভাবে কিছু পথ হেঁটে কিছু পথ রিক্সায় চেপে বোধানন্দবাবু প্রায় একঘণ্টা পরে "সেবা আশ্রমের" গেটের সামনে এসে পৌঁছলেন।

রিক্সাচালক বোধানন্দবাবুর কাছ থেকে ভাড়ার টাকা হাতে নিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল,

"হাপনার মুতো দোয়া হামি দেখি নাই।"

"আমি দয়া করার কে ভাই? আমি তোমাদের ভালবাসি এই পর্যন্তই। যা হোক, অন্য একদিন দেখা কোর আমার সঙ্গে।"

বোধানন্দবাবু আশ্রম চত্বরে ঢুকলেন। পরিপাটি করে ফুলফলের গাছে আশ্রম সাজান। এই আশ্রমের প্রধান মহারাজ দূর থেকে তাঁর স্কুলের নতুন শিক্ষককে দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে এলেন এবং যে ঘরে বোধানন্দবাবুকে থাকতে দেওয়া হবে সেই ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরটা বেশ বড়। ঘরে দুটো বই রাখার কাঁচের আলমারী দেখে তিনি খুব খুশী হলেন।

করমটোলী গ্রাম। রাঁচী শহর থেকে দূরে ছোট বড় পাহাড়ের মাঝে এই গ্রাম। এই গ্রামেই সেবা আশ্রম এবং তার স্কুল। স্কুলটা খোলা হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। গরীব, সরল আদিবাসীদের ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে সেইজন্যই এই স্কুলের গোড়াপত্তন করা করা হয়েছে। এক সংসার ত্যাগী বাঙালী সন্ন্যাসী এই আদিবাসী গ্রামে এসে আশ্রম খুলে নাম দিয়েছিলেন 'সেবা আশ্রম।' আদিবাসীদের উন্নতির জন্য তিনি

গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এই আশ্রমের মধ্যে স্কুলটি খোলেন, স্কুলটি সুরু হবার দুবছরের মধ্যে তিনি দেহরক্ষা করেন। তিনি নিয়ম করে গেছেন যাঁরা সন্ন্যাসী অথবা সন্ন্যাসীর মত প্রকৃত ত্যাগী পুরুষ তাঁরাই কেবল এই স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারবেন। বর্তমান প্রধান মহারাজও স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সেই নিয়মই মেনে চলছেন।

বোধানন্দবাবু ছোট বয়েস থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। এত বড় বিশাল দেশ, কত উর্বর জমি এখানে আছে, তবুও এখানকার লোকজন সকলে পেটভরে খেতে পায় না, অনাহারে মারা যায়। কত হাজার বছরের পুরনো এই দেশ তবুও এখানকার বেশীর-ভাগ লোক অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছে। এই চিন্তা তাঁকে প্রায়ই দুঃখ দিত। তিনি নিজে যথেষ্ট শিক্ষিত হয়ে মা বাবার অনুমতি নিয়ে এই আশ্রমে এসে যোগ দিলেন।

আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কয়েকটা বই পড়ে তাঁর মন কেঁদে উঠেছিল তাদের সেবা করার জন্য। এই আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে সুযোগ তিনি পেয়ে গেলেন।

প্রথম দিন চারটে বিভিন্ন ক্লাসে তিনি পড়ালেন। উনি ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন কারণ ছাত্রদের মধ্যে আদিবাসীদের সংখ্যা খুব কম। যাও বা আছে তারা কেউই প্রায় গরীব নয়।

উনি সন্ধ্যে বেলা প্রধান মহারাজের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, ছাত্রদের মধ্যে আদিবাসীরা সংখ্যায় এত কম কেন?

প্রধান মহারাজ এ কথা শুনে বোধানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং বললেন—

"ওরা পড়তে চায় না। কেবলই কাজ করে বেড়ায়, জঙ্গলে ঘুরে ওরা কাঠ কাটে, শিকার করে। ওদের পড়াশুনা হবার কথা নয়।"

"সে কী? আমি যে শুনেছিলুম অন্য কথা! সে থাক।"

"বলুন বলুন কী বলতে চান।"

"মানে চাকরির বিজ্ঞাপনে দেখেছিলুম এটা আদিবাসীদের জন্য স্কুল।"

"হ্যাঁ, তাই তো। যিনি এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তিনি অনেক চেষ্টা করে দশ বিশটা ছাত্র জোগাড় করতে পেরেছিলেন। তবে এখন পরীক্ষা দিয়ে এখানে ঢুকতে হয় তো। আদিবাসীরা আডমিশন টেষ্ট-এ পারে না। তাই বাধ্য হয়ে আমরা অন্য ছেলে নিই। যারা পরীক্ষায় পারে তারা এখানে ঢোকে।"

"ও" বলে চলে যাচ্ছিলেন বোধানন্দবাবু, প্রধান মহারাজ ডাকলেন, "শুনুন"—

"একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন যে ওরা জংলি। ওদের নিয়ে বেশী চিন্তা না করে স্কুলের রেজাল্ট যাতে ভালো হয় সেদিকে নজর রাখবেন। জানেন ওরা এত বদমাস যে ওদের পাড়া দিয়ে গাড়ী করে গেলে গাড়ীতে ঢিল মারে। বোধানন্দবাবু হো হো করে হেসে উঠে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। উনি বলতে চেয়েছিলেন ওদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন তাই ওরা আপনাদের দেখলে রেগে যায়।

বোধানন্দবাবু নতুন এসেছেন। আদিবাসীদের সম্পর্কে যত জেনেছেন, তা সবই প্রায় বই পড়ে নয়ত অন্যের কাছ থেকে শুনে জেনেছেন। তারা সত্যকারের ভালো না মন্দ তা মেলামেশা না করে নিশ্চিত হওয়া যায় না। সেইজন্য স্থির করলেন প্রত্যেকদিন বিকেলে পায়ে হেঁটে তিনি ওদের গ্রামে ঘুরবেন এবং মেলামেশা করার চেষ্টা করবেন।

পরদিন বিকেলেই পড়ন্ত রোদে বোধানন্দবাবু গ্রাম দেখতে বার হলেন। যে সব ছেলেমেয়েরা রাস্তার পাশে খেলা করছিল, তারা খেলা বন্ধ করে ওনার দিকে তাকিয়ে রইল। উনি ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "অবাক হয়ে আমাকে দেখছ কেন তোমরা?"

বোধানন্দবাবু হিন্দীতে প্রশ্ন করলেন ওদের। কারণ ওরা নিজেদের ভাষা ছাড়া কেবল হিন্দী ভাষা বোঝে, ওরা উত্তর দিল—

"আপনি ইস্কুলের মাস্টারজী ? নতুন মাস্টারজী ?

"হ্যাঁ"

"আপনি মুখিয়ার বাড়ী যাবেন ?"

"না না। আমি তোমাদের কাছেই এসেছি।"

যখন বোধানন্দবাবু হাত বাড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন, ওরা ভয় পেয়ে ছুটে পালাল।

কিন্তু বেশীদিন ওরা দূরে থাকতে পারল না। প্রতিদিন বোধানন্দবাবুকে দেখে ওদের ভয় ভেঙে গেলো। ওরা এক এক করে ওনার কাছের মানুষ হয়ে গেল। ওদের আপনজন হয়ে উঠলেন তিনি।

শুধু ছোটদের কাছেই নয়, বড়দের কাছেও গেলেন, উনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জানতেন। ঘরে ঘরে গিয়ে অসুস্থ মানুষের সেবা করলেন তাদের চিকিৎসা করে। যারা খাতা, বই, শ্লেটের অভাবে পড়তে পারে না, তাদের উনি সেইসব কিনে দিলেন। এ ধরণের অনেক উপকার করে ওদের মধ্যে একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হয়ে উঠলেন।

উনি বুঝতে পারলেন ওদের পড়া শেখানোর কেউ নেই বলে শিখতে পারে না এবং ঐ স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। তাই তিনি রাত্রিবেলায় ছেলেপুলেদের নিজের ঘরে এনে পড়াতে লাগলেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছে অর্থ সাহায্য চাইলেন যাতে তাদের প্রত্যেকের ঘরে একটা করে লণ্ঠন কিনে দিতে পারেন এবং আরো বইপত্র কিনে দিতে পারেন। অর্থসাহায্য পেলেন যথেষ্ট এবং উঠে পড়ে লেগে গেলেন আদিবাসীদের যাতে পড়াশুনোর ইচ্ছা হয় এবং তাদের উন্নতি হয়।

আশ্রমের প্রধান মহারাজ স্কুলের পরিচালনার জন্য একটা কমিটি তৈরী করেছেন। কমিটিতে রাঁচী শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আছেন। রামেশ্বর শর্মা স্কুলের প্রেসিডেন্ট, তিনি দিল্লীতে সরকারী বড় পদে চাকরি

করেন। মাসে একবার করে তিনি রাঁচী আসেন। প্রধান মহারাজকে যখনই বোধানন্দবাবু বলেন, "আদিবাসী ছাত্রদের জন্য এটা দরকার, সেটা দরকার" তখনই প্রধান মহারাজ বলেন, রামেশ্বর শর্মাকে চিঠি লিখুন, উনি অনুমতি দিলে তবে আপনার প্রয়োজন মেটাতে পারবেন।"

একদিন বোধানন্দবাবু আদিবাসী ছাত্রদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়ে রামেশ্বর শর্মাকে চিঠি লিখলেন, কারণ খাবারের পয়সা রোজগার করার জন্যই আদিবাদী ছেলেরা জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটে, শিকার করে, মোট বহন করে। যদি ওরা স্কুলে খাবার পায় তবে ওরা স্কুলে দলে দলে ভর্তি হবে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সফল হবে।

খুব বেশী সময় লাগল না উত্তর পেতে, চিঠি পাঠাবার দিন দশেক পরে ক্লাস শেষ করে বিকেলে ঘরে ফিরে দেখেন রামেশ্বর বাবুর চিঠি। চিঠি হাতে নিয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে খুলে ফেললেন। কিন্তু এ কী লিখেছেন ভদ্রলোক। মনের ওপর বিষাদের ছাযা নেমে এল। চেয়ারে বসে পড়লেন মাথায় হাত দিয়ে। চিঠিতে রামেশ্বর শর্মা লিখেছেন—

আমার প্রিয় বোধানন্দবাবু,

আশ্রম থেকে এবং রাঁচী শহরের লোকজনদের কাছ থেকে যে সমস্ত রিপোর্ট পেয়েছি, সেইমত আপনাকে জানাতে চাই যে ঐ আশ্রমে আপনার থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। সেইজন্য আপনাকে দিল্লীর ব্রাঞ্চঅফিসে যোগদান করতে বলছি। দিল্লীর অধিবাসীদের ছেলেপুলেদের জন্য এখানেও একটা স্কুল আছে। সুতরাং পত্রপাঠ এখানে চলে আসুন।

ইতি

শ্রীরামেশ্বর শর্মা

বোধানন্দবাবু ঠিকমত বুঝে উঠতে পারলেন না যে কেন তাঁকে রাচী ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। অনেক ভাবলেন। যতই

ভাবলেন ততই দুঃখ পেলেন, এই সব সরল হাসিখুশীভরা সোমা, বুধা, মংলা, বীরলালের মত আরো শতশত আদিবাসী ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দিল্লী চলে গেলে কে তাদের লেখাপড়া শেখাবে! কী করে তাদের উন্নতি হবে! নানান আশঙ্কার কথা চিন্তা করতে করতে উনি প্রধান মহারাজের ঘরে ঢুকে চিঠির কথা বললেন।

প্রধান মহারাজা বললেন, "আমার কাছেও চিঠি এসেছে। তবে আপনাকে ট্রান্সফার করা হতে পারে একথা আমি বারবার আপনাকে জানিয়েছি। এখন আমার কিছুই করার নেই।"

বোধানন্দবাবু মনে মনে কাঁদছিলেন। ধরা গলায় ধীরে ধীরে বললেন। "আমি যা কিছু করেছি সবই তো আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য করেছি তা কি অন্যায়? ওদের মঙ্গল—" ওনার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। আর বলতে পারলেন না। ছলছল দৃষ্টিতে প্রধান মহারাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

প্রধান মহারাজ কিছুটা থতমত খেয়ে গেলেন। মাথা নীচু করে আমতা আমতা করে বললেন, "না না আমাকে এজন্য দায়ী করবেন না। শহরের যে সমস্ত বড় বড় লোক আশ্রমে যাতায়াত করেন, তাঁরা চান না এসব নোংরা জামা প্যান্ট পরা অথবা আদ্লা গা করা ছেলেমেয়েরা এই আশ্রমে ঘোরাঘুরি করুক। উপরন্তু তিওয়ারীজির জমিকে আপনি খেলার মাঠ বানিয়েছেন, আরো অনেক কারণে..."

আর এক মুহূর্ত বোধানন্দবাবু বসে থাকতে পারলেন না। পা তাঁর কাঁপছিল। শরীর মাথা ঝিমঝিম করছিল। তবুও তিনি আদিবাসী পল্লীর দিকে এগোতে লাগলেন। ছেলেমেয়েরা দেখল মাস্টারজীর মুখে হাসি নেই, চোখে আনন্দ নেই। তিনি সকলকে ডেকে একটা সেগুন গাছের নীচে গিয়ে বসলেন, "আমার ছোটছোট বন্ধুরা শোন, আমি কাল থেকে এখানে থাকছি না। অনেক দূরে দিল্লী চলে যাচ্ছি—"

ছেলেমেয়েরা অনেক কান্নাকাটি করল। কেউ কেউ বায়না ধরল

তারা মাস্টারজীর সঙ্গে দিল্লী যাবে, কেউ বা বলল "না না, আমাদের ছেড়ে আপনাকে যেতে দেব না।" কোন রকমে বুঝিয়ে মনের ভেতর গভীর দুঃখ নিয়ে তিনি নিজের ঘরে ফিরে এলেন। ঠিক করলেন সকালের বাসে তিনি কলকাতা ফিরবেন, সেখানে মা বাবার সঙ্গে আলোচনা করে তবে দিল্লী রহনা হবেন।

পরের দিন করমটোলীর আকাশ লাল করে সূর্য সবে উঠেছে। কী একটা গণ্ডগোলের শব্দে বোধানন্দবাবুর ঘুম ভেঙে গেল, বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, আশ্রমের কাঁটা তারের বেড়ার বাইরে দলে দলে আদিবাসী ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে,

"আমাদের ছেড়ে দাও। বন্ধ দরজা খুলে দাও, আমরা মাস্টার-জীর কাছে যাব…"

এ দৃশ্য দেখে বোধানন্দবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রায় ছোটার মত করে হেঁটে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি গেট খুলে দিতে পারেন এই ভয়ে প্রধান মহারাজ এবং আশ্রমের অন্য কয়েকজন তাঁর কাছে ছুটে গেল। তিনি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন তিওয়ারীজীও তাঁর পেছনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন। বোধানন্দবাবুকে দেখে ছেলেমেয়েরা আনন্দে উল্লাস করে উঠল মাস্টারজী কী জয়।

উনি হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে বললেন। সকলে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এ ব্যাপার দেখে তিওয়ারীজি কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন। তিনি কল্পনাও করেন নি যে বোধানন্দবাবুর এক নির্দেশে অসভ্য, অশিক্ষিত আদিবাসীরা শান্ত হতে পারে, শিষ্টতার পরিচয় দিতে পারে।

বোধানন্দবাবু গেট খুলে ছেলেদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। সকলে এখন ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। কেউ তাঁর হাতে পাহাড়ী ফুলের তোড়া তুলে দিল, কেউ বা দিল মাটির খেলনা। যে যা পেরেছে নিয়ে

এসেছে তাদের প্রিয়জনের জন্য। সবই একে একে তুলে দিল বোধানন্দ-বাবুর হাতে।

এই ঘটনায় তিনি আনন্দের অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। তাঁর হৃদয়ের এক পাশে বইতে। লাগল আনন্দের ঝর্ণা, আর এক পাশে ওদের ছেড়ে চলে যাবার জন্য বিয়োগব্যথার ধারা। ওদের দিকে তাকিয়ে তিনি অনুভব করলেন তাঁর জীবন ধন্য, সার্থক, মনুষ্যরূপী দেবতাদের ভালবাসা আর আশীর্বাদ ছাড়া মূল্যবান জিনিস আর কী আছে পৃথিবীতে?

হঠাৎ বোধানন্দবাবুর চোখ পড়ল তিওয়ারীজীর ওপর। তিনি তিওয়ারীজীকে বললেন—

"আপনার জমিতে এরা আর কোনদিন খেলবে না। তাহলে দুঃখ আপনার কমবে তো?"

প্রধান মহারাজ তিওয়ারীজীর পাশেই ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বোধানন্দবাবু বললেন—

"হিংসা আর অন্যায়ের আশ্রম ছেড়ে প্রকৃত আশ্রমে চলে যাচ্ছি। এই সমস্ত দরিদ্র ছেলেপুলেদের মনের মধ্যেই নতুন আশ্রমের সন্ধান পেয়েছি, প্রাচুর্যে ভরা দিল্লী শহরে আমি যেতে চাই না।"

এই বলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বোধানন্দবাবু আদিবাসী পল্লীর দিকে এগোতে লাগলেন।

মোরাবাদী রহস্য

নন্দিতার বাবা ঠিক করেছিলেন এবারের দুর্গা পূজোর ছুটিতে কলকাতায় না থেকে, ছুটিটা কাটাবেন হিমালয়ের পায়ের কাছে অর্থাৎ হরিদ্বার থেকে শুরু করে আরও উত্তরদিকে যতদূর যাওয়া যায়।

নন্দিতারা অনেক জায়গায় ঘুরেছে—কাশী, বৃন্দাবন, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা। কিন্তু হরিদ্বার, উত্তরকাশী, কংখল ; এসব সুন্দর সুন্দর জায়গায় আজও যাওয়া হয় নি। কারণ অবশ্য নন্দিতা, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই ওর সর্দি জ্বর হয়। পূজোর ছুটির সময় হরিদ্বারে কলকাতার তুলনায় যথেষ্ট বেশী ঠাণ্ডা পড়ে। গত ছমাস হল নন্দিতার সর্দি জ্বর হচ্ছে না দেখে তার বাবা সাহস করে বহুদিনের মনের ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে চান। কিন্তু নন্দিতা বেঁকে বসল। সে বলল, 'রাঁচী চল না বাবা।' তার বাবা যত তাকে বোঝান, 'আগে একবার তো গেছি। দুবছর বয়েসের কথা তোর অবশ্য মনে নেই। পরে যখন হোক যাওয়া যাবে। বেশী তো দূর নয়। ট্রেন বা বাস যাতে করেই যাওয়া যাক, বারো ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছান যায়। নন্দিতার বাবা যখন তাকে কোনমতেই বোঝাতে পারছেন না, তখন রেগে-মেগে বলে উঠলেন, 'তুই একটা আস্ত পাগল, তাই বিখ্যাত পাগলা গারদের জায়গা রাঁচীকে তোর এত পছন্দ'।

নন্দিতা কেঁদে ফেলল তাকে পাগল বলার জন্য। কান্না কান্না গলায় চুপি চুপি বাবার কানে কানে বলে ফেলল রাঁচী যাবার জন্য সত্যই সে এত পাগল হয়ে উঠেছে কেন ?

নন্দিতাদের পাড়ায় অজয় গৌড় গাঙ্গুলি বলে ক্লাস নাইনের এক ছেলে থাকে। অনেকে তাকে অজয়দা না বলে ডাকে গৌড়দা বলে।

তাদের নাকি আগে মালদা জেলার গৌড় অঞ্চলে বাড়ি ছিল। তার ঠাকুরদাদা কলকাতায় ব্যবসা করতে চলে আসেন। সেই সময় থেকেই তারা কলকাতার লোক। অজয়দার মাথায় নাকি অনেক লোকের বুদ্ধি একসঙ্গে জমা হয়ে আছে। পৃথিবীর প্রায় সব খবরাখবর তার নখ দর্পণে। সে জানে না এমন ব্যাপার নাকি পৃথিবীতে কমই আছে। অজয়দার বন্ধু বান্ধব কেউ কেউ তাকে AG বলে। আবার কেউ কেউ আগ মার্কা বলে। আগ মার্কা জিনিস তা সে বার্লিই হোক, কি সরষের তেলই হোক, তা যেমন খাঁটি ; অজয়দার বুদ্ধি আর সাহস তেমনই খাঁটি। আরও অন্য সব ব্যাপারেও সে যে খাঁটি ছেলে তার প্রমাণ সে করতে পারে। সে লেখাপড়ায় ভালো, খেলাধুলোয়ও সে খুব পটু। তার স্বাস্থ্য ভালো, সত্য কথা বলতে সে ভয় পায় না। যারা বদমাস তাদের শাস্তি দিতে সে পিছ পা হয় না। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হলো সে সখের ডিটেকটিভ হিসাবে বন্ধু মহলে খুব নাম করে ফেলেছে।

এই অজয় গৌড় তার কাকার সঙ্গে রাঁচী বেড়াতে যাচ্ছে এবারের পূজোর ছুটিতে। অজয় অনেকের কাছে শুনেছে, রাঁচীতে মোরাবাদী বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে টেগোর হিল বলে একটা ছোট্ট পাহাড় আছে। টোগোর হিলের ওপরের সেই বাড়িটার কথা অনেকে শুনেছে, অনেকে দেখেছে। এই বাড়িতে নাকি সন্ধ্যেবেলায় এক অদ্ভুত চেহারার ভুত বাস করতে আসে। সকালবেলা সেই ভুত সেই পাহাড় ছেড়ে অন্য কোনো জঙ্গলে বাস করতে চলে যায়। সেই ভুতের কানটা হাতির কানের মতো বড় আর নাকটা খুব উঁচু লম্বা। সেই ভুতের সন্ধানেই অজয়ের যাওয়া। তার রাঁচী যাবার আসল উদ্দেশ্যটা অবশ্য সে তার কাকাকে বলে নি। কারণ তার মা যদি তা শুনতে পান, তবে কিছুতেই ছেলেকে তিনি ভুতের বাড়ির কাছাকাছি যেতে দেবেন না।

নন্দিতার মুখ থেকে এই ঘটনা শুনে নন্দিতার বাবা আনন্দে

উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি ছোট বয়সে ভুতেদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছেন। ভুতেদের জন্ম, তাদের বিভিন্ন জাত, তাদের আদব কায়দা, গলার স্বর, তাদের কান্না, গান এরকম আরও অনেক কিছুর সম্বন্ধে তিনি বইতে অনেক কিছু পড়েছেন। ছোট বয়েসে তাঁর একটু ভয় ভয় করত, সেইজন্য ভুতের ডেরার কাছে ভুলেও কোনদিন যান নি। এখন তাঁর বয়স অনেক বেড়েছে, সাহসও বেড়েছে অনেক। তিনি হাততালি দিয়ে উঠলেন ভুত দেখার সুযোগের আনন্দে। তার ওপর ছোটখাট ডিটেকটিভ সাহেবের কাজকর্ম দেখার জন্য তিনি বেশ উত্তেজনা বোধ করতে লাগলেন। রাজী হয়ে গেলেন রাঁচীর টিকিট কাটার জন্য।

পূজোর আগে পঞ্চমীর দিন নন্দিতা, নন্দিতার বাবা এবং নন্দিতার মা হাওড়া-হাতিয়া এক্সপ্রেসে রওনা হলেন।

রাত্রি শেষ হয়ে ভোর হয় হয়, এমন সময় ট্রেন রাঁচী স্টেশন স্পর্শ করল। রাত্রি বারটার পর থেকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা বাড়তে শুরু করেছিল। রাঁচী স্টেশনে এসে মনে হল নন্দিতার বেশ কাঁপুনি ধরেছে—ঠাণ্ডা যেন এখানে বেশ আয়াস করে রাজত্ব করছে।

স্টেশনের প্ল্যাটফরমে অজয়দার সঙ্গে নন্দিতার দেখা হল। একই সঙ্গে ওরা রওনা হয়েছিল। কিন্তু অজয় আর অজয়ের কাকা প্রথম শ্রেণীতে চড়েছিল, নন্দিতারা দ্বিতীয় শ্রেণীর থ্রি-টায়ারে করে রাঁচীতে এসেছে। দশ ঘন্টা পরে আবার তাদের দেখা হল। একই জায়গায় ওরা থাকবে সে সব ঠিকঠাক আগে থেকে করা ছিল। সেইমতো পাঁচজনের দল আলো-আঁধারির ভোরে রওনা হল মোরাবাদীর দিকে।

এই কাক ভোরে সকলেই কম বেশী কাঁপতে শুরু করেছে। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে নন্দিতা ভালো করে কান আর গলা মাফলার দিয়ে ঢাকল। কারণ এই সময় যদি সে সর্দি-জ্বরে ভোগে, তবে তার এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাবে। অজয় চারিদিক

দেখতে দেখতে একা একা সকলের লাগে হাঁটতে লাগল। চারপাশের ব্যাপার স্যাপারে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে বুঝে নিতে চেষ্টা করল। একজন রিক্সাওয়ালা ওদের এসে বলল, 'কেয়াবাবু, কাঁহা যাওগে ?

—টেগোর হিল।

—ও টাইগার হিল, চলিয়ে।

দুটো রিক্সা করে ওরা রাঁচী মেন রোড ধরে আনন্দময়ীমার আশ্রমের পাশ দিয়ে সোজা চলতে লাগল। অজয় এতক্ষণ বাদে মুখ খুলল। সে রিক্সাওয়ালাকে বলল—

—তোমরা টেগোরকে টাইগার বল কেন ?

—রাচী জিলার এই পাহাড়ে বহুত টাইগার ছিল আগে। ইস লিয়ে হামরা টাইগার বলি।

—না বাপু না। কলকাতার খুব নাম করা টেগোর বা ঠাকুর পরিবারের কেউ একটা বাড়ি করেছিলেন এই পাহাড়ের মাথায়। এখনও তা আছে। এই জন্যেই টেগোরদের হিল অর্থাৎ টেগোর হিল বলে সকলে একে জানে।

নন্দিতা দুজনের কথা বেশ ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছিল কারণ জোর গলায় ওদের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল। নন্দিতা চুপ করে শুধু কথা শোনার মেয়ে নয়। কিছুক্ষণ উসখুস করে হুট করে নন্দিতার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে গেল,

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ছিলেন জান ? বিরাট বড় কবি। উনি এশিয়ার মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

—না মাইজি। হামরা আদিবাসী লোক। লিখাপড়া কুছু শিখি নাই। সারিদিন খালি রিক্সা টানি। হামরা গরীব তো।

ছুটো বেলা থিকে এই কাম করছি।

নন্দিতার খুব কষ্ট হল এই কথা শুনে। বেচারী রিক্সাওয়ালাকে যদি কেউ ইস্কুলে ভর্তি করে দিত, তবে তো সে অনেক কিছু শিখতে পারত। নন্দিতা আবার বলল,

—আমি সামনের রিক্সায় আছি। তুমি ঠিক আমার পেছনে রিক্সা চালাচ্ছ। তোমার সঙ্গে কিন্তু কথা বলতে বলতে যাব। বিরক্ত হবে না তো ?

—না জী। বলিয়ে।

—তোমরা কি সাঁওতাল ?

—আমরা ওরাওঁ।

—তা তুমি যাই হও, আমি তোমাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখাব।

রিক্সাওয়ালা এই কথা শুনে হেসে ফেলল,

—হামার লেড়কাকে লিয়ে যাও মাইজি। উ ইখানে ছুটখাট হিন্দি ইস্কুলে পোড়ে। কুলকাত্তার বড়া ইস্কুলে উকে ভর্তি করিয়ে দাও, উ একদিন বহুত বড়া হবে, আদিবাসীদের দুখ একদিন দূর করতে পারবে। রিক্সাওয়ালা আর নন্দিতার মধ্যে আরো অনেক কথা হল।

কথা শেষ হতে নন্দিতার বাবা নন্দিতাকে চারিপাশ বুঝিয়ে বুঝিয়ে দেখাতে লাগলেন। এরই ফাঁকে তিনি রাঁচীর ভুগোল, ইতিহাস, সমাজ আরও অনেক জানার বিষয় বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'রাঁচী, পালামৌ আর হাজারিবাগ জেলায় আগে আদিবাসীরাই সংখ্যায় ছিল বেশী, এখানে বৃষ্টির সময় খুব বৃষ্টি হয়। সেজন্য চাষবাস এখানে ভালো মতো হয়। সারা বছর এখানে রাত্রের দিকে ঠাণ্ডাভাব থাকে। শীতের সময় এখানে ভীষণ শীত পড়ে। সারাবছরই এখানে কফি পাওয়া যায়। বিরাট বড় বড় জঙ্গলের কাঠ আর পাহাড়ী জমির তলায় খনির সন্ধানে ইংরেজরা প্রায় আড়াই শ বছর আগে থেকে এখানে আসতে শুরু করে। বহু বড় বড় জঙ্গল কেটে সভ্য মানুষেরা এখানকার বন সম্পদ নষ্ট করেছে। এখানকার প্রায় একতলা বাড়ি সমান উঁচু হাতি আর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো বড় বড় বাঘ। রাঁচীর জঙ্গল ছেড়ে চলে

গেছে, অনেকে আবার মারা পড়েছে শিকারী কিংবা ব্যবসায়ীদের হাতে।'

নন্দিতা হঠাৎ বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল,

—আমি দিদিদের কাছে শুনেছি এখানে 'বেতলা' বলে একটা জঙ্গল আছে। সেখানে নাকি বাঘ আর হাতী দুইই দেখতে পাওয়া যায়?

—'বেতলা' এই জেলায় নয়। পালামৌ জেলায়।

—বাবা, এখানে ওরাওঁ ভিন্ন আর কোনো আদিবাসী থাকে না?

—থাকে। মুণ্ডা, বীরহোড় এমনকি কিছু কিছু সাঁওতালও এখানে থাকে। মাহাতো বলে আর এক সম্প্রদায় থাকে। তবে তারা বেশ উন্নত। সেইজন্য পাহাড়ে বা জঙ্গলে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে একসঙ্গে জোট বেঁধে এরা থাকে না। ভালো ভালো গ্রাম তৈরি করে এরা বাস করে।

—এখানে আমরা কি কি দেখব বাবা?

—হুড্রু আর জোনা ফল্‌স্, রাঁচী হিল। মেসরাতে যাব বি. আই. টি দেখতে, ওখানে তোমার রায় জেঠু চাকরি করেন। সব শেষে যাব নেতার হাট—যেখানে সূর্য ওঠা আর সূর্যাস্ত দেখতে দলে দলে মানুষ ভীড় জমায়।

রিক্সা করে যেতে যেতেই নন্দিতার খুব ক্ষিধে পেয়ে গেল। অথচ বাড়িতে সকাল বেলায় টিফিন খেলে স্কুলে যাবার সময় একদম ভাত খেতে পারে না। আর না বলে পারল না।

—বাবা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে

—পাবেই তো। আমারও পেয়েছে। তোর মায়েরও ক্ষিধে পেয়েছে, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারছেন না।

ব্যাগ থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বার করে দু'জনে মিলে খেতে শুরু করে দিল। টাটানগর স্টেশন থেকে নন্দিতার বাবা ওয়াটার বটল্‌-এ জল নিয়েছিলেন। সেই জল খেয়েই ওদের ক্ষিধে বেড়ে গেছে।

রাঁচীর জল আরও ভালো। নন্দিতার বাবা বললেন, 'রাঁচীর জল পেটে পড়লে বিস্কুট পেটে গিয়েই হাওয়া হয়ে যাবে। তখন প্রয়োজন হবে মাংসের আর মোটা রুটির।' খেয়ে দেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে নন্দিতা রাস্তার দু পাশের দোকান পাট, সিনেমা হল, চার্চ, হোটেল, রেঁস্তোরা এসব দেখতে দেখতে আর বাবাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে রামকৃষ্ণমিশন গেষ্ট হাউসের গেটে এসে থামল।

গেষ্ট হাউসটা বেশ পুরনো, নতুনভাবে রঙ করা হয়েছে। মিশনের এক কর্মচারীর মুখে নন্দিতা শুনল, এই বাড়িটা ঠাকুর পরিবারের বাড়ি ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ বাড়ীতে কোনদিন এসেছিলেন কিনা বা এখানে বসে কবিতা, গল্প কিংবা অন্য কিছু লিখছেন কিনা তা কেউ বলতে পারল না। এর চারপাশে ছোট বড় অনেক বাড়ী রয়েছে দেখে নন্দিতার বেশ রাগ হল। ভেবেছিল বেশ ফাঁকা ফাঁকা রহস্য ঘেরা বাড়ি হবে এটা, আর অনেক উদ্ভট কাণ্ড ঘটবে এ বাড়িতে। সঙ্গে তো সাহসী ডিটেকটিভ আর বাবা আছেই। সুতরাং ভয় করার কোনো কারণ তো নেইই, উপরন্তু রহস্যের জাল চোখের সামনে ভেদ হতো—উঃ কী মজাই না হতো! কী রোমাঞ্চকর দৃশ্যই না দেখা যেত!

সকলে হাত মুখ ধুয়ে, সঙ্গে নিয়ে আসা রুটি, কেক খেয়ে, এক কাপ করে গরম কফি গলায় ঢেলে নিজেদের বেশ কিছু মেজাজী করে নিল। বেড়ানোর ব্যাপারটা আরও সতেজ হয়ে উঠল। অজয় চটপট করে ব্যাগে টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে, ব্যাগটা কাঁধে ফেলেই নন্দিতাকে বলল, 'চল দিনের আলোয় ভালোভাবে টেগোর হিলটা দেখে আসি। সবে রোদ্দুর উঠেছে, এই ফাঁকে পাহাড়ের চারপাশ দেখে নেওয়া উচিত।

'চল অজয়দা। কিন্তু একা একা দুজনে যাব? আমার কেমন ভয় ভয় করছে।'

'আমি তো তোর চেয়ে বড়? সঙ্গে আছি। কোনো কাজে আগে

থেকে ভয় পেতে নেই। আগে ভয় সামনে আসুক। তখন যত পারিস ভয় পাস। শোন, আমার মতলবটা হচ্ছে ওখানে মিশনের লাইব্রেরীতে আগে যাওয়া। পরে কাউকে বলব ঘুরে ফিরে পাহাড়-টাকে দেখাতে। নিশ্চয় কেউ না কেউ আমাদের অনুরোধ রাখবে বল ?

'তা হলে ভালো, ভয় করার কোন কারণ নেই।'

'উদ্দেশ্য তা নয় রে। ভীতুর মতো চিন্তা করবি না! যদি করিস নিয়ে যাব না। একাই যাব।

'না না বল তোমার উদ্দেশ্যটা বল, এই দেখ আমি কেমন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছি।'

'এখানকার একজনকে গাইড মানে পথ প্রদর্শক হিসাবে নিলে, টেগোর হিলের ঘরে যে ভুত আছে—সে আমাদের সন্দেহ করতে পারবে না। বুঝতেই পারবে না আমরা কি জন্য এখানে এসেছি।

'তুমি কি বুদ্ধিমান অজয়দা!'

'বাবাকে বলে চলে আয়। হ্যাঁ শোন, কথা খুব কম বলবি। তুই যেমন কথা বেশী বলিস, তেমনই আবার বোকা ঢেঁড়স।'

'কি ? আমি বোকা ?'

'আরে ক্ষেপিস কেন ? বোকা মানে ডিটেকটিভদের মতো বুদ্ধি তোর নেই, এটাই বলতে চাইছি।'

'ঠিক আছে চল। কথা আমি একদম বলব না। তবে যেখানেই আমি অবাক হয়ে তাকাব, সেখানেই বুঝবে আমি কিছু জানতে চাই। অসুবিধে না হলে বোঝাবে। না হয় একটু কেশে ইশারায় জানিয়ে দেবে এখানে বোঝান যাবে না।'

আগের কথামত দুজনে প্রথমে মিশনের লাইব্রেরীতে গেল। মিশনের একজন মহারাজ ওদের কথাবার্তা চালচলন দেখে বুঝতে পারলেন, ওরা কলকাতার বাঙালী। তিনি ওদের কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ ?

অজয় উত্তর দিল, 'কলকাতা।'

লাইব্রেরীয়ান ওদের শুকতারা আর আনন্দমেলা পড়তে দিলেন। নন্দিতা আনন্দে আটখানা হয়ে পত্রিকা তুটো নিয়ে চেয়ার টেবিলে বসে পড়ল। পড়ার বড় টেবিলে অনেক ধরণের পত্রিকা ছড়ানো ছিটোন ছিল। বাংলা হিন্দি, ইংরাজি এই তিন ভাষার পত্রিকাই ওখানে ছিল। ছোটদের হিন্দি পত্রিকা 'লোটপোট' নিয়ে পড়তে স্বুরু করে দিল অজয়। অজয় হিন্দি পড়তে এবং লিখতে তুইই জানে।

অজয়ের মনোযোগ লোটপোটের দিকে যতই থাকুক। টেগোর হিল দেখার ব্যাপারটা সে ভুলে যায় নি। ঘণ্টাখানেক পরে লাইব্রেরীয়ানকে গিয়ে বলল।

—আমরা এখানে একেবারে নতুন, কিছু চিনি না। টেগোর হিলটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন ?

—চল, কিন্তু তোমাদের বাবা মা জানেন তো ?

—হ্যাঁ। আমরা বলে এসেছি।

—চল।

মিশনের লাইব্রেরীয়ান, নন্দিতা আর অজয় তিনজনে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে বেশ কিছুটা ওপরে উঠে গেল, নন্দিতা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল এই তো সেই বাড়ি! অজয় কড়া মেজাজে নন্দিতার দিকে কটমট করে তাকাতেই নন্দিতা গম্ভীর হয়ে গেল। বাড়ির পাশে সিমেণ্ট বাঁধান বসার জায়গা আছে। বাড়ির চারপাশের পাহাড়ি গাছপালা, কয়েক ধরণের ফুলের গাছ, বড় বড় পাথরের ঢেলা সবকিছু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল অজয়। এই স্বুযোগে লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গে তুজনের বেশ ভাব জমে উঠল। লাইব্রেরীয়ান বললেন, 'আমার নামটা একটু বড় অরুনাংশু শেখর চক্রবর্ত্তী। তোমরা আমাকে অরুণ কাকু বলবে।'

অরুণ কাকু আধঘণ্টা মতো ওদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাহাড়ের

চারপাশ এবং বাড়ির বাইরের আনাচ কানাচ দেখিয়ে দিয়ে বললেন। 'দিনকাল খারাপ, তোমরা সন্ধের পর একা একা এখানে থেকো না, ছ্যাঁৎ করে উঠল নন্দিতার বুক। কেন কাকু?

'এমনি বলছিলাম। কেউ থাকে না সন্ধের পর। যদি কোনো অঘটন ঘটে, বাঁচাবার মতো কাছে কাউকেই পাবে না।'

ঐ বাড়ির একটা ঘরের দরজা খোলা ছিল। অজয় এগিয়ে গিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। কয়েকটা ঘর আছে ভেতরে। অরুণকাকা বললেন, সকালে এই বাড়িটার দুটো ঘর নিয়ে স্কুল বসে।

নিজেকে একটু সংযত করে অজয় অরুণকাকুকে জিজ্ঞাসা করল 'মাস্টার মশাই এখন কোথায়?' অরুণকাকু বললেন।

—ছোটনাগপুরের কোন গ্রামে তাঁর বাড়ি। পূজোর ছুটিতে তিনি বাড়ি গেছেন।

—ও, তবে দরজা যখন খোলা, তখন কেউ না কেউ এই বাড়ি দেখাশোনা করছে।

—নিশ্চয় কেউ আছে। চল এবার যাওয়া যাক।

গেষ্ট হাউসে ফিরে আসার পর নন্দিতা অজয়দাকে অনেক প্রশ্ন করেছে। কিন্তু অজয়ের ওই একই উত্তর, 'আজ রাত্রেই সব জানতে পারবি। বুঝতেও পারবি অনেক কিছু, শুধু মাথা ঠাণ্ডা করে দেখে যা। কিছুতেই কি কি অদ্ভুত জিনিস বা ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে, যার সূত্র ধরে টেগোর হিলের ভূত-রহস্য ভেদ করা যায়—তা নন্দিতার কাছে প্রকাশ করতে চাইল না।

বিকেলে এখানকার আবহাওয়া অনেকটা কলকাতার বসন্তকালের মতো। তফাতটা শুধু উত্তরের হাওয়া। সন্ধ্যার আকাশ যতই অন্ধকার হতে থাকে, ততই শীত বাড়তে থাকে। সেইজন্য নন্দিতা এবং অজয়রা সকলেই হাল্কা সোয়েটার, মাফলার ইত্যাদি নিয়ে টেগোর হিলে বেড়াতে আসল। নন্দিতার বাবা, অজয় এবং নন্দিতা এক সঙ্গে ছিল। কারণটা শুধু তিনজনেই জানে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। চারপাশ জুড়ে অন্ধকার নেমে আসতে লাগল। লোকজন যারা পাহাড়ে বেড়াচ্ছিল, তারা সকলেই নীচে নেমে গেল। নন্দিতার মা ওদের নেমে যেতে বললেন। নন্দিতার বাবা বললেন 'আমরা কিছুক্ষণ বাদে যাব। ভয় নেই অজয় তো রয়েছে। বুদ্ধিমান আর সাহসী ছেলে সঙ্গে থাকলে ভয় কিসের? নন্দিতার মা একাই চলে গেলেন। অজয়ের কাকা ব্যবসার ব্যাপারে কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য রাঁচীর আপার বাজারের দিকে চলে গেলেন।

পাহাড়ের অন্ধকার ঘেরা পরিবেশের মধ্যে শুধু তিনটি মূর্তি এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল। সমস্ত পাহাড়ের পরিবেশ গা ছমছমের আবেশে ভরে উঠল। ওরা তিনজন ঘুরতে ঘুরতে নিস্তব্ধে বাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তৎক্ষণাৎ হো হো করে বিকট হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠে পাশের ঝোপটার দিকে তাকাল। মনে হল, ঐ ঝোপের মধ্য থেকেই এই শব্দ শোনা গেল। পাহাড়ে জোরে শব্দ করলে তা বার বার ধাক্কা খেয়ে অনেক শব্দ সৃষ্টি করে, শব্দের এই প্রতিধ্বনির ফলে ঠিক কোথা থেকে হাসির আওয়াজ হয়েছিল, অজয় ঠিকমত তা বুঝতে পারল না। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হল না যে শব্দ খুব কাছে থেকে করা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল—যদি কিছু অথবা কাউকে দেখা যায়। কিছু দেখা গেল না। আর কোনো আওয়াজও ভেসে এল না। শুধু দূর থেকে আদিবাসীদের গানের সুর আর মাদলের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। এই অন্ধকার পুরীর কাছে দাঁড়িয়ে ওরা তিনজন অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অজয় সাহস করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল—ঝনাৎ করে একটা আবার আওয়াজ হল। অজয় বুঝল কাঁসার কানা উঁচু পাত্র পড়ে যাওয়ার আওয়াজ। বিহারের লোকেরা এ ধরণের পাত্র বেশী ব্যবহার করে। বিপদ যে ওদের খুব কাছে এবং ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে, এটা বুঝতে তিনজনের কোনো অসুবিধা হল না।

তিনজন গায়ে গা লাগিয়ে ছিল, তবুও নন্দিতা প্রায় কেঁদে ফেলল। পাছে অজয়দা কিছু বলে, এজন্য হাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরল। কান্নার আওয়াজ বেরোল না। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনজনে নতুন কিছু ঘটার আশায় উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—দাঁড়া সঁব বঁদমাঁয়েসেঁর দঁল। কিঁসের জঁন্যে আঁমার বাঁড়ীতে ঢুঁকেছিঁস?

নাকি সুরের অদৃশ্য গলার আওয়াজে অজয় ঘুরে দাঁড়াল, হাতের মুঠো শক্ত করে বক্সিং লড়ার ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, যে দিক থেকে গলার আওয়াজ হয়েছিল সেই দিকে। নন্দিতা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এজন্য নন্দিতার বাবা নন্দিতাকে জড়িয়ে ধরলেন। পাঁচ মিনিট কোনো শব্দ হল না। তিনজনে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে অধীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ কোনো বিপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় অজয় কৌশল পালটাল। ঝড়ের ঠিক আগে সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়ে যায়। বড় কোনো গণ্ডগোলের আগে তেমনই চারপাশ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে। নিস্তব্ধতার মধ্যেই ওৎ পেতে থাকে বিভীষিকা। যদি অদৃশ্য শয়তানটা অন্ধকারের মধ্যে ঘরের যে কোনো কোণ থেকে, কোনো অস্ত্র নিয়ে অজয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; সেজন্য অজয় কাঁধের ব্যাগ থেকে সাইকেলের চেন বার করে সতর্ক-ভাবে বাগিয়ে রইল। নন্দিতার বাবা এখানে আসার সময় পকেটে করে একটা ছুরি এনেছিলেন, তিনিও শক্ত করে সেটা ধরে রইলেন এবং চোখের মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের চতুর্দিকে চোখ রাখলেন। তিনিও বুঝেছিলেন, এই নিস্তব্ধতা বিপদের সংকেতমাত্র।

আবার সেই নাকি সুরের শব্দ, 'তোঁরা আঁমাকে খুঁজে বাঁর কঁরার চেঁষ্টা কঁরছিঁস? পাঁরবি নাঁ। মাঁরতেও পাঁরবি নাঁ। আঁমি হাঁওয়াঁর সঁঙ্গে মিঁশে থাঁকি। বুঁঝলি সাঁহসীর দল? এতক্ষণ বাদে অজয়ের মুখ থেকেই প্রথম কথা বেরোল, 'তুমি, থুড়ি আপনি কি ভূত? না প্রেত? নামটা যদি দয়া করে একটু বলেন।'

'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। নাঁম? লোঁকে অঁবশ্য নাঁকা ভুঁত বঁলে। এঁই বাঁড়ির, এঁই পাঁহাড়ের মাঁলিক আঁমি। রাঁতের অঁন্ধকারে যাঁরাই এঁই পাঁহাড়ে আঁসে; আঁমি তাঁদের কাঁছ থেঁকে ট্যাঁক্সো আঁদায় কঁরি। দেঁ টাঁকা দেঁ আঁগে— নাঁ দিঁলে টুঁকরো টুঁকরো কঁরে ফেঁলব তোঁদের। হিঁ হিঁ চাঁরদিন পঁর আঁবার মাঁনুষের মাঁংসের স্বাঁদ পাঁব।

কেটে ফেলার কথা শুনে নন্দিতা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। ভয়ে তাড়াতাড়ি করে মেঝেতে ঠং করে পয়সা ফেলে বলল, 'আর পয়সা নেই ভূতকাকু এটাই নিয়ে আমাদের ছেড়ে দাও—'

—উঁ হুঁ অঁত কঁম পঁয়সা নঁয়। দঁশ টাঁকা বিঁশ টাকার কঁমে আঁমি কাঁউকে ছেঁড়ে কঁথা বঁলি নাঁ।।

নন্দিতার বাবা জানেন বড়দের ভূতে ধরে না। ভূতেদের যত নজর কেবল ছোটদের ওপর, তিনি সাহস করে গলা খাকারি দিয়ে বললেন,—আপনার নাম 'নাঁকা ভুঁত' বেশ, তাহলে আপনি বোধহয় মহারাষ্ট্রের লোক, মানে মারাঠা? বম্বেতে 'সাকি নাকা' 'রাধা নাকা' এরকম নাম বাসে চলতে চলতে শুনেছি। মারাঠী ভাষায় নাকার অর্থ মোড়, যেমন কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়, শিয়ালদার মোড়, সিঁথির মোড়। উত্তরে আবার সেই হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করে হাসির শব্দ শোনা গেল।

বোঁকার দঁল, ভুঁতের আঁবার কোঁন জাত আঁছে নাঁকি রেঁ?

—আছে বৈকি। মেছো ভূত, গেছো ভূত, দেঁতো ভূত এরকম সব গোষ্ঠী আছে বাঙালী ভূতেদের। অবশ্য শোনা কথা। গোষ্ঠীটা সত্যি হলে জাতটাও সত্যি। আমাদের মানুষদের গোষ্ঠীও আছে, জাতও আছে। তাহলে আপনাদের গোষ্ঠী বা জাত কিছুই নেই?

—বাঁজে কঁথা রাঁখ। টাঁকা ফেঁল আঁগে।

—টাকা নিয়ে কি হবে আপনার? আপনি তো হাওয়ার সঙ্গে মিশে থাকেন। মিষ্টির দোকান, হোটেল থেকে টপাটপ খাবার তুলে নিয়ে খেয়ে নেবেন।

—কিঁন্তু আঁমার কাঁপড় জাঁমা?

এই কথা শুনে নন্দিতার বাবা চট করে পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে মাটিতে ফেলে দিলেন। অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা লম্বা কালো হাত বেরিয়ে এসে সেই টাকা তুলে নিল।

হঠাৎ দমাস করে একটা আওয়াজ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে আ-আ-আ করে একটা কাতর আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতার বাবা টর্চ জ্বালিয়ে ফেললেন। নন্দিতা বিস্ময়ে চোখ বড় করে দেখল অজয় শুয়ে পড়ে কার যেন পা ধরে প্রাণপন চেষ্টা করছে টেনে আনবার। গুরুম্ করে কান ফাটানো আওয়াজে নন্দিতা ভীষণভাবে চমকে উঠল। তারপর যা দেখল তাতে তার গলা শুকিয়ে গেল। টর্চের আলোয় স্পষ্ট সে দেখছে তার কাছেই আলকাতরার মত কালো রঙের অদ্ভুত একটা জন্তু! জন্তুটার কান দুটো ভীষণ বড় আর তার বিরাট লম্বা এক নাক, এ বাদে সবটাই তার মানুষের মত। অজয়দা পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

অজয় হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'যদি পালাবার চেষ্টা কর মাথা এ ফুঁড় ওফুঁড় করে দেব। যা বলছি ঠিক মতো উত্তর দিয়ে যাও—

—তোমার গায়ের রঙ এত কালো কেন?

সেই অদ্ভূত জন্তুটা হাত জোড় করে কান্নার সুরে বলল,

—কাজলের কালি তেল মিশিয়ে গায়ে মেখেছি।

—নাক আর কানটা এত বড় কেন?

—আজ্ঞে ছোট বয়েসে মাস্টারদের কাছে পড়াশুনো পারতুম না বলে কান আর নাক টেনে বড় করে দিয়েছে। নন্দিতার বাবা হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি তাহলে সাক্ষাত হনুমান গোষ্ঠীর বল? হনুমানরা নিজেদের মধ্যে টানাটানি হেঁচড়া-হেঁচড়ি করে দেখেছি।'

নাক কান টেনে বড় করার ব্যাপারটা নিয়ে তিনজনেই হাসতে লাগল। এই সুযোগে অদ্ভুত জীবটা এক চড়ে অজয়ের হাতের পিস্তলটা মাটিতে ফেলে দিয়ে পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। নন্দিতার বাবা ল্যাং মেরে তাকে ফেলে দিয়ে পিঠের ওপর চেপে বসে,

চুলি মুঠি ধরে দুবার তার কপাল মাটিতে ঠুকে দিনে। ঐ জীবটা আর নড়াচড়া করতে পারল না। অজয় আর নন্দিতার বাবা পরীক্ষা করে দেখলেন নাকা ভুত অজ্ঞান হয়ে গেছে।

এদিকে তখন সবেমাত্র রাত্রি স্থরু হয়েছে। সময় তখন সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট হবে। এ সময়ে পাহাড়ের পাশ দিয়ে বহু আদিবাসী সারাদিনের পরিশ্রমের পর নিজেদের গ্রামে ফিরছিল। রাখালেরা গরু নিয়ে, মোষ নিয়ে হুড়ড় হুট্ আওয়াজ করতে করতে বাড়ির দিকে চলছিল। তারা পিস্তলের শব্দ শুনতে পেয়ে থতমত খেয়ে গেল প্রথমে। তাদের কাছে ঐ বাড়ি ভুতের বাড়ি বলেই পরিচিত। তারা ভুল করেও কোনদিন রাত্রিবেলা ঐ পাহাড়ে চড়ে না। অবশ্য আগে এরকম ছিল না। বছর দুই হল কোন মানুষ খেকো ভুত এ বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছে—এ কথা আশপাশের গ্রামের সব লোকই জানে, যারা রোজ এ পথ দিয়ে যাতায়াত করে তারাও জানে। তারা এই সময় পাহাড়ে আলো দেখে আর পিস্তলের আওয়াজ শুনে একে একে দাঁড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের নীচে। তাকিয়ে রইল ওপরের দিকে। ভাবল পুলিশ কিংবা মিলিটারি হয়ত পাহাড়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ পর তাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, যখন তারা দেখতে পেল একজন ভদ্রলোক আর দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে সিঁড়ি দিয়ে একজন কালো লোককে চ্যাংদোলা করে ধীরে ধীরে নীচে নামছে।

—কেয়া হুয়া বাবুসাব। কোই বদমাস কো গুলি মারা? নন্দিতার বাবা চেঁচিয়ে বললেন, 'বদমাস তো ঠিকই। তবে এ হচ্ছে তোমাদের পাহাড়ের নাকা ভুত'।

'কেয়া বোলা' বলে একসঙ্গে সব চিৎকার করে উঠল ভয়ে বিস্ময়ে!

অজ্ঞান অবস্থায় নাকা ভুতকে নামানো হল। ওরা তিনজনে হাঁপাতে লাগল, কারণ ওরা কম ওজন বয় নি। অজয় ব্যাগ থেকে লম্বা কান আর নাক তুলে ওদের সকলকে দেখাল। ওদের সকলে

চোখ বড় করে একবার নকল নাক, কান দেখল আর একবার তিনজনকে দেখল।

যা যা ঘটেছিল অজয় সব কিছু ওদের ভালো ভাবে বোঝাল। শুনে সকলে আনন্দে নাচতে শুরু করে দিল। ওরা আগে গরম বা বসন্ত কালের রাত্রে পাহাড়ের ওপর মাদল বাজিয়ে গাঁন করতে পারত। কিন্তু দু বছর ধরে এই নকল ভূতের ভয়ে রাত্রে পাহাড়ে যেতে সাহস পায় নি। এবার তাদের ভয় কেটে গেল। আবার তারা প্রাণ খুলে নাচতে আর গাইতে পারবে বুঝতে পেরে, আনন্দে অজয় আর নন্দিতাকে মাথায় তুলে নাচতে শুরু করে দিল।

পরে সকলে মিলে নকল ভূতের মাথায়, চোখে, মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সুস্থ করে তুলল। সে সুস্থ হয়েই কাকুতি মিনতি করতে লাগল তাকে ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু অনেকদিন ধরে ভয় দেখিয়ে শুধু সে যে রোজগার করেছে তাই নয়, সে এখানকার আদিবাসীদের আনন্দ উৎসবকেও পণ্ড করেছে। আইনের কাছে সে দোষী। কোনো রকম অনুরোধ ওরা শুনতে রাজী হল না। এমনকি কোনো কোনো আদিবাসী তাকে কেটে ফেলতে চাইল। শেষ পর্যন্ত অজয় এবং নন্দিতার বাবা ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে থানাতে জমা দিয়ে এল।

ভূত ধরার খবর চারপাশে রটে গেল। ছোট ছেলেমেয়েরা বিশ্বাসই করতে চাইল না যে ঐ ভূত আদতে ভূতই নয়। এজন্য তারা তাদের পড়াশুনো বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লেগে গেল। বড়রা তাদের বোঝালেন, কী করে মুখোশ পরে শয়তান লোকটা এতদিন ভয়াল পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাকে এখন থানায় পুলিশের মার খেতে হবে, তাও বললেন। ভূতকে দেখতে না পাক যারা কলকাতা থেকে ডিটেকটিভের কাজ করতে মোরাবাদী এসেছে, তাদের তো দেখতে পারে? এই আশায় সকলে ছুটল মিশনের গেষ্ট হাউসে। সকলেই অজয় ডিটেকটিভকে কিছু না কিছু পুরস্কার দিতে চায়—কেউ নিয়ে এল ফুল, কেউ পেন, কেউ বা গল্পের বই। এরকম

নানা ধরণের পুরষ্কারে অজয়ের ব্যাগ ভর্তি হয়ে গেল। বিজয়ের আনন্দে তার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অজয় তাদের বলল, 'এ কাজ শুধু একা আমার দ্বারা সম্ভব হত না। কাকু আমার সঙ্গে না থাকলে আমি নাকাকে জব্দ করতে পারতাম না। কারণ তার গায়ে অসম্ভব জোর। তার পালাবার এবং মারপিট করার কৌশলও কম জানা নেই। আমার মতো অল্প বয়েসের কোনো ছেলের তাকে ঘায়েল করতে যাবার অর্থ নির্ঘাৎ মৃত্যু।'

ওরা সকলে মিলে নন্দিতার বাবার কাছে গেল। নন্দিতার বাবা ওদের বললেন, 'তোমরা ছোট বয়েস থেকে আমার মতো ব্যায়াম কর, স্বাস্থ্য ঠিক কর, যুযুৎসু আর ক্যারাটে শেখো। দেখবে তোমরাও আমার মত, অনেক বদমায়েসকে সাহস করে কাৎ করে দিতে পারবে। সহজে তোমরাও ভয় পাবে না।' তিনি আরও বললেন, 'নন্দিতার উৎসাহ না থাকলে আমি এখানে আসতাম না। সুতরাং তোমরা নন্দিতাকেও ধন্যবাদ জানাও, ও একটু ভীতু বটে কিন্তু আমাদের সঙ্গে রাত্রিবেলা ঐ পাহাড়ে থাকার মতো ইচ্ছে আর সাহস দুই-ই ছিল তার।' তারা সকলে নন্দিতাকেও কিছু কিছু জিনিসপত্র দিল। নন্দিতার বাবা সকলকে কালাকান্দ খাওয়ালেন। থানায় নাকাকে নিয়ে যাবার সময় তিনি কুড়ি টাকায় কালাকান্দ কিনেছিলেন। হৈ হৈ করতে করতে যে যার বাড়ির দিকে চলে গেল।

রাত্রি দশটার সময় গেষ্ট হাউসের সামনে পুলিশ ভ্যান এসে থামল। পুলিশ সুপার গাড়ী থেকে নেমে সোজা নন্দিতার বাবাকে গিয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন। বললেন, 'কী যে বিরাট উপকার আপনারা আমাদের করলেন, তা ভাষায় বোঝান যায় না। আচ্ছা আপনি কি বেঙ্গল পুলিশের ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছেন? উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে না না। আমি একজন ইঞ্জিনীয়ার। পুলিশ টুলিশ নই।'

এ কথা শুনে পুলিশ সাহেব ধপাস করে বসে পড়লেন চেয়ারে।

'কিন্তু আমার মাথায় তো ঢুকছে না এত বড় ব্যাঙ্ক ডাকাতের খবরই বা পেলেন কোথায়? সাহসই বা হল কী করে। নন্দিতার বাবা, অজয়, নন্দিতা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল, "কী বলছেন আপনি, নাকা ব্যা-ঙ্ক-ডা-কা-ত?"

"হ্যাঁ জী। কলকাতায় ষ্টেট ব্যাঙ্ক, বর্ধমানে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক আর পাটনার ইউকো ব্যাঙ্কে ও দলবল নিয়ে ডাকাতি করেছে। খড়্গপুরে ষ্টেট ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে গিয়ে লোকজন ওদের তাড়া করে। দলের সকলে ধরা পড়ে যায়। কিন্তু ও বেটা সর্দার ধরা পড়ল না। দু বছর ধরে সারা পশ্চিম বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যায় পুলিশ তন্ন তন্ন করে ওকে খুঁজেছিল। কিন্তু ওর টেকনিক একেবারে নতুন ধরণের।

অজয় পুলিশ অফিসারের কথা মাঝপথে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'খবরের কাগজে দুবার একজন পলাতক ব্যাঙ্ক ডাকাতের ছবি বেরিয়েছিল। এই কি সেই ডাকাত?' 'ঠিক ধরেছে বাবু। হ্যাঁ, ওর টেকনিকের কথা বলছিলুম। দু বছর ধরে ও বেটা বাংলাতেও যায়নি, পাটনাতেও যায়নি। পুলিশ চারিদিকে জাল পেতে ছিল ওকে ধরবার জন্যে। এজন্যে ও আদিবাসী গ্রামে এসে প্রথম থাকবার চেষ্টা করে। আদিবাসীরা গরীব, লেখাপড়া জানে খুব কম লোক, খবরের কাগজ ওদের গ্রামে একদম প্রায় পাওয়া যায় না। কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়ে দিল। কিন্তু থানার পুলিশের একটু সন্দেহ হয়েছিল ওর ওপর। কারণ একজন বাঙালী নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে আদিবাসী সমাজে থাকতে চাইবে কেন? ও বোধহয় সেটা বুঝতে পারে। পরে এই টেগোর হিলের ওপরের বাড়ির স্কুলে এসে মাস্টারমশাইকে অনেক অনুরোধ করে পাকাপাকিভাবে এখানে থেকে যায়। মাস্টারমশাইকে ও দিনের বেলায় রান্না করে দিত। তিনি কোন রকম সন্দেহ করেন নি। বেটার ঠকিয়ে ইনকাম করার পথ জানা আছে অনেক। সেই একটা পথ সে নিয়ে নিল। মাস্টারমশাই

রোজ সন্ধ্যেবেলা টিউশনি করতে চলে যেতেন, তখনই সে ঐ রকম সেজে লোকজনকে ভয় দেখিয়ে রোজগার করত। মাস্টারমশাইকে অনেকে ভূতের কথা বলেছে। উনি ওসব বিশ্বাস করতেন না। এক আদিবাসী মোড়ল অবশ্য টেগোরহিলের ভূতের সম্বন্ধে আমাকে একদিন জানিয়েছিল। আমরা ওসব পাত্তা দিই নি। কেন না আদিবাসীরা খুব ভূতকে ভয় করে। আবার ভয় পেয়ে পূজোও করে।'

অজয় কোমড়ে হাত দিয়ে পুলিশ অফিসারকে বলল, 'আমরা তাহলে এত বড় ডাকাতকে ধরে দিয়ে আপনাদের খুব উপকার করেছি। এটা তো জেনে করিনি? ভূতের রহস্য বার করতে গিয়ে ডাকাত ধরেছি। এটা লাক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু অন্য কেস-টেস থাকলে আমাদের জানাবেন। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসাবে আমরা খারাপ নয়। ছোট খাট রহস্য আমরা অনায়াসে সমাধান করতে পারি।'

——

সকলের মিছিলে

অনেক বাছাবাছি করে শেষে মা ছেলের নাম রাখলেন 'ইন্দ্র'। দেবতাদের রাজার নামে নাম। হ্যাঁ, ইন্দ্রর মতই বটে! যেমন টকটকে ফরসা গায়ের রঙ, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, টানাটানা চোখ। আর তেমনই ঢলঢল চোখ দুটোর মধ্যে সব সময় যেন জিজ্ঞাসা আর হাসিখুশী ভাব। অনেকেই ছেলের মুখ দেখে বললেন, এ তো ছেলে নয় যেন সাক্ষাৎ কার্তিক ঠাকুর। কেউ বললেন, শিবের মত দেখতে। কেউ বা বললেন—রাজপুত্রের মত! অবশেষে মা ঠিক করলেন, 'ইন্দ্র নামই ঠিক নাম,' 'ইন্দ্র' নামটা মুখে মুখে ঘুরতে লাগল আত্মীয় স্বজন-দের মধ্যে।

কিন্তু এই নাম রাখাতে ইন্দ্রর বাবা খুশী হতে পারলেন না। তাঁর মত হল আমার ছেলে তো মানুষ। সে মানুষের মত মানুষ হবে। দেবতা তো হবে না। ইন্দ্র যখন স্কুলে ভর্তি হল তখন তিনি এক কাণ্ড করে বসলেন। ভর্তির ফর্মে ছাত্রের নামের জায়গায় লিখে দিলেন—লিঙ্কন রায়। প্রায় হঠাৎই এ নামটা তাঁর মাথায় এসে গিয়েছিল।

স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে বাবাকে ইন্দ্র বলেছিল, 'কেন এই নামটা রাখলে বাবা?' ইন্দ্রর বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, 'লিঙ্কন একজন মস্ত বড় বীর ছিলেন। মানুষের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছিলেন।'

'কি করেছিলেন বাবা?'

'আমেরিকা বলে একটা দেশ আছে। সেখানে অনেক কালো রঙের মানুষের বাস। তাদের সাদা রঙের মানুষরা খুব কষ্ট দিত। তাদের তিনি কষ্টের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। আরো অনেক কিছু

করেছিলেন দেশের মানুষের জন্য। ঐ মহৎ মানুষের নামেই তোমার নাম দিলাম'।

ইন্দ্র কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'মা যদি রাগ করে?' এ কথা শুনে ইন্দ্রর বাবা হঠাৎ রেগে উঠলেন, 'মাকে বোলো আমি ঐ নাম দিয়েছি।'

সেদিন রাত্রে ইন্দ্রর (বা লিঙ্কনের) মা একটু রাত্রি করে বাড়ী ফিরেছিলেন। ইন্দ্র তখনও জেগে বসেছিল। কারণ স্কুলে ভর্তি হওয়ার অভিজ্ঞতা মাকে না বলা পর্যন্ত সে শান্তি পাচ্ছিল না। তিনি ঘরে ঢুকতেই ইন্দ্র বলে উঠল,

—মা ইস্কুলে ভর্তি হয়েছি।

—বেশ, কিন্তু এখনও ঘুমোওনি কেন?

—তুমি এত দেরি করে এলে কেন মা?

—কতদিন না তোমায় বলেছি তুমি আমায় এই প্রশ্ন করবে না? এখন ঘুমোও।

ইন্দ্র বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমও এসে গেল ওর চোখে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে চেঁচামিচিতে ঘুম ভেঙে গেল। ইন্দ্রর মা খুব চেঁচাচ্ছিলেন। ইন্দ্র চোখ বন্ধ করেই বুঝতে পারল ওরনতুন নাম 'লিংকন' হয়েছে বলে মা ভীষণ রাগারাগি করছেন।

লিংকন স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর অনেক কিছু দেখতে আর বুঝতে পারে। যা আগে পারত না। ওর মা যে প্রায়ই দেরি করে বাড়ী ফেরেন, সেটা ওর মোটেই ভাল লাগে না। ওদের ওপরের ফ্ল্যাটে কিম্বা পাশের বাড়ীতে পিংকি বা ঋষির মা চাকরি করেন না। সারা-দিন ওরা মায়ের আদর খায়। ওদের মা ওদের বেড়াতে নিয়ে যান। কত ভালবাসেন। তবে আমার মা কেন চাকরি করতে সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান আর রাত্রিতে বাড়ী ফেরেন? কেন মা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে? ওর ভীষণ কান্না পায় এতে। তবে ওর বাবা

প্রায়ই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরেন। লিংকনের ক্লাসের একজন আন্টি ওকে বলেছিলেন, 'তোমার বাবা মস্ত বড় বিদ্বান। তিনি আমাকে কলেজে পড়িয়েছেন। তুমি তোমার বাবার মত বড় হবে, হ্যাঁ?' এই কথা শুনে খুব আনন্দ আর গর্ব হয়েছিল লিংকনের।

কলকাতার গড়িয়াহাট রোডের ধারে লিংকনদের বাড়ী। রাস্তার ধারে ওদের যে ঘরটা আছে তারই জানলা খুলে বসে সে তার বাইরের পৃথিবীকে দেখতে পায়। বাবা কলেজের অধ্যাপক। মা চাকরি করতে বেরিয়ে যান। সকালে লিংকনের স্কুল। স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে বেশীর ভাগ দিনই সে মা-বাবাকে দেখতে পায় না। বাড়ীতে একজন কাজ করার মাসী থাকে। সে লিংকনকে খেতে দেয়। স্নান করায়, আদর যত্ন করে। লিংকনের বাবা মাও তাকে 'মাসী' বলেন। মাঝে মাঝে সেই মাসী লিংকনের জন্য লজেন্স বিস্কুট এনে দিয়ে বলে, 'খেয়ে নাও। মাকে কিন্তু বোল না। মা তাহলে বকবেন।' আগে দু একবার লিংকন মাকে বলে দিয়েছিল। এখন আর বলে না। কারণ বললে লজেন্স পাওয়া যাবে না, উল্টে মাসী এবং লিংকন দুজনেই বকুনি খাবে।

লিংকনের মা মাসীর সঙ্গে কম কথা বলতে বলেছেন। মা বলেছেন, কাজের লোকের সঙ্গে বেশী কথা বলতে নেই। মা'র সামনে কথা না বললেও মায়ের আড়ালে সে মাসীর সঙ্গে অনেক কথা বলে

এইভাবেই লিংকন ক্লাস ফোর-এ উঠে গেল। শরীরটা ওর কোন-দিনই মজবুত নয়। কিন্তু লেখাপড়ায় সে যথেষ্ট ভালো। এখন ওর বয়স প্রায় দশ বছর হয়েছে। এখন আর ঘরের কোণে বসে শুধু বই পড়তে তার ভাল লাগে না। শরীরের ভেতরের রক্ত, বুকের ভেতরের রক্ত যেন ছুটে বেড়াতে চায়। ভাবে বাড়ীতে না জানিয়ে সে ফুটবল ক্লাবে নাম লেখাবে। ছুটবে, খেলবে আর সকলের সঙ্গে মিশবে। সব সময় সে বারণ মানবে না। টি, ভি-তে সে প্রায়ই ফুটবল খেলা

দেখে। একদিন সে বাবাকে বলে ফেলেছিল,— মাকে বললে সঙ্গে সঙ্গে না করে দেবে। বাবা তুমি একটা ক্লাবে ঢুকিয়ে দেবে? আমি ফুটবল খেলব।

লিংকনের বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ। দেব, ভর্তি করিয়ে দেব। স্কুল জীবনে আমি মোটামুটি ভাল ফুটবল খেলতুম। জান, আমাদের গ্রামে অনেক ভাল ভাল মাঠ ছিল। কলকাতায় তো মাঠই নেই। তাই রাস্তার ওপরে প্রায়ই ছেলেরা ফুটবল খেলে। কিন্তু····।

কিন্তু অবধি বলে থেমে গেলেন লিংকনের বাবা। নিজের লেখা জোকার কাজে মন দিলেন। অবশ্য মনে মনে তিনি ঠিক করলেন, যে ভাবেই হোক সামনের বছরের থেকে লিংকন ক্লাবে যাবেই। ফুটবল খেলবেই।

জুন মাস। স্কুলে গরমের ছুটি। প্রচণ্ড গরমে চারপাশ যেন জ্বলছে। তার ওপর লোড সেডিং। লিংকন চেষ্টা করেও ঘুমতে পারল না। একটা গল্পের বই হাতে নিয়ে জানলার ধারে এসে বসল।

বই পড়তে পড়তে কীসের যেন একটা হইচই কানে ভেসে এল। বই বন্ধ করে রাস্তার দিকে তাকাল সে। দেখল কয়েকজন বড় বয়েসের ছেলে ছুটে আসছে! হঠাৎ বিরাট এক শব্দে ও চমকে উঠল! আরো একটা শব্দ হল। চারিদিক ধোঁয়ায় ভরে গেল। কাজের মাসী ওকে বারবার ডাকতে লাগল, 'ওখান থেকে উঠে এস। বাইরে গণ্ডগোল বেঁধেছে। জানলা বন্ধ করে চলে এস।' লিংকন জানলা বন্ধ করবে কি করবে না ভাবছে এমন সময় রাস্তার দিকে তাকাতেই সে আঁৎকে উঠল, "রক্ত! রক্ত! ওকে তোমরা মারছ কেন? ছেড়ে দাও···" বলতে বলতে মাসীর হাত ছাড়িয়ে দরজা খুলে ছিটকে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

লিঙ্কন রাস্তায় পা দিতেই আর একটা ভীষণ শব্দ হল। আর

সঙ্গে সঙ্গেই সে মাটিতে আছড়ে পড়ল। ওর চোখের সামনের বাড়ী ঘর সব কিছু দুলতে দুলতে ধীরে ধীরে আবছা অন্ধকারে ডুবে গেল। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে লিঙ্কন ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন ওর ঘুম ভাঙল, ও বুঝতে পারল একটা ছোট লোহার খাটে সে শুয়ে আছে। এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে সে দেখতে পেল চারিদিকে ওই রকমই লোহার খাট পাতা। কেউ কাঁদছে, কেউ গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে। পাশের টুলে ওর বাবা বসে ছিলেন। তিনি ছেলের হাতে হাত রাখলেন।

'বাবা আমি কোথায়?' বলে লিঙ্কন কেঁদে ফেলল। লিঙ্কনের কপালে তার মা হাত রাখলেন। তাঁর চোখেও জল। মা বাবাও যে তার মত কাঁদে তা সে আগে কোনদিন দেখেনি। ওদের কান্না দেখে লিঙ্কনের ভীষণ কষ্ট হল।

এখন আবার ওর শরীরে ভীষণ কষ্ট হতে শুরু করল। অনেক কষ্টে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল,

—মা আমার কী হয়েছে? হাত পা বাঁধা কেন? নাকের মধ্যে নল ঢোকানো কেন?

—বাবা কেঁদ না। সেদিন রাস্তায় না বেরুলে তোমার এই অবস্থা হত না, তোমার নাকের মধ্যে অক্সিজেনের নল। নড়াচড়া পড়লে তোমার কষ্ট হবে। আরো ব্যথা করবে।

সিস্টার এসে লিঙ্কনের মা বাবাকে এবং লিঙ্কনকে কাঁদতে বারণ করলেন। লিঙ্কনের বাবা লিঙ্কনকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, ডাক্তারবাবু বলেছেন তুমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। আবার স্কুলে যাবে। খেলতে পারবে।

হাসপাতালের ঘণ্টা বাজতে ওরা চলে গেলেন। লিঙ্কনকে সব সময় দেখাশুনা করার জন্য একজন মহিলাকে রেখে গেলেন লিঙ্কনের বাবা।

যমে-মানুষে লড়াই এর পর কোন কোন মানুষ যেমন জিতে যায়।

সেইভাবেই মৃত্যুদূতের সঙ্গে লড়াই করে লিঙ্কন বেঁচে গেল। বেঁচে বাড়ী ফিরে এল ঠিকই। কিন্তু হাসিমুখে সে ফিরতে পারল না। ওর শরীরের একটা অংশ হাসপাতালে রেখে আসতে হল—ওর ডান পায়ের হাঁটুর নীচের অংশ অপারেশন করে বাদ দেওয়া হল। সম্পূর্ণ শরীর নিয়ে সে ফিরে আসতে পারল না। লিঙ্কন হয়ে গেল প্রতিবন্ধী। লিঙ্কনদের সংসারে নেমে এল অন্ধকার। ওর মনে কান্না।

লিঙ্কনের মা কয়েকদিন অফিস গেলেন না। লিঙ্কনকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়, ওঠা বারণ। নিস্তব্ধ দুপুরে প্রায়ই ওর মনে ভেসে ওঠে ওই দুঃস্বপ্নের মত দিনটার কথা! নিজেকে সে অনেক বারই প্রশ্ন করেছে—কেন এত বড় বড় ছেলেরা মারপিট করছিল? কেন একজন আর একজনকে ছুরি মেরে রক্ত বার করে দিয়েছিল? কী করেছিল লোকটা? আচ্ছা যার শরীর রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল সে কী এখনও বেঁচে আছে? বাবাকে সে জিজ্ঞাসা করেছে। বাবা উত্তর দিয়েছেন, 'ওরা দুষ্টু তাই মারপিট করছিল। মাকেও জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন। মা উত্তর দিয়েছেন, 'তোর কী দরকার তাতে? ভবিষ্যতে মস্তান হতে চাও; না? ছোটলোকদের মাঝখানে গিয়ে সারা জীবনের জন্য খোঁড়া হয়ে গেলি, এখনও লজ্জা হয় না?' লিঙ্কন কেঁদে ফেলেছিল। সেদিন অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। এ কথা আর কোনদিন মাকে সে জিজ্ঞাসা করেনি। পা হারিয়ে, এত ধমক খেয়েও ওর মনে বারবারই মনে হয় ও কোন দোষ করেনি। কাউকে কেউ বাঁচাতে গেলে দোষের কোথায়?

মায়ের ওপর লিঙ্কনের খুব রাগ হয়। কারণ মা যদি অফিসে না যেতেন তবে তো এ রকম দুর্ঘটনা ঘটত না। মা ওকে বোঝাতে পারতেন, গণ্ডগোলে বোম পড়ে, বলতে পারতেন।

মা'র মত কাজের মাসীকে সে ভয় করে না। তার কথা শোনে না তাই তো সে বাইরে বেরিয়ে গেছিল। ঝন্টু মন্টুর মা তো বাড়ীতে থাকেন তার মা কেন থাকেন না?

লিঙ্কনের মা যেদিন থেকে আবার অফিস যেতে শুরু করলেন সেদিন থেকে আবার লিঙ্কন নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে লাগল। কাজের মাসীর সঙ্গে কথা বলে কিছুটা সময় ওর কাটতে লাগল। একদিন মাসীকে লিঙ্কন প্রশ্ন করল,

—আচ্ছা মাসী তুমি বল তো বড়রা কেন ছোটদের মত মারপিট করে? একজন একজনকে মেরে ফেলে?

মাসী যে কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। কারণ যে উত্তর ওর বাবা মা দিতে পারেন না সেই উত্তর তার পক্ষে কী করে দেওয়া সম্ভব? মাসী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে।

—'তোমার মা যেমন বিনা কারণে তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেন, সেই রকম…'এই কথা বলেই মাসী নিজের হাত দিয়ে নিজেরই মুখ চেপে ধরে। পরে বলে, না না সে রকম ঠিক নয় তোমার মত ভাল ছেলে ওরা নয়, ওরা বদমাস। ওরা লেখাপড়া শেখেনি, তাই কোন কাজ করা উচিত নয় তা ওরা বোঝে না। তুমি কিন্তু মাকে এসব কথা বোল না। মা তাহলে রাগ করবেন আমার ওপর।'

গালে হাত দিয়ে লিঙ্কন কী যেন ভাবতে শুরু করল। মাসী বুঝতে পারল এবার লিঙ্কন আরো অনেক প্রশ্ন করতে পারে। তাই সে রান্না ঘরে ঢুকে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফেরার দু মাস পর হাঁটাচলা করার জন্য লিঙ্কনকে ক্রাচ দেওয়া হল। বহুদিন শুয়ে বসে থাকার পর সে হাঁটবার সুযোগ পাবে, এই ভেবে আনন্দে, খুশীতে ওর মন ভরে গেল। ক্রাচ বগলে লাগিয়ে চলাফেরা শেখানোর সময় ডাক্তারবাবু বললেন,

—আবার তুমি স্কুলে যাবে। পার্কে বেড়াতে যাবে। কিন্তু মারপিট দেখে দাঁড়িয়ে যেও না কিন্তু।

এক রবিবার বাবার সঙ্গে লিঙ্কন রাস্তায় বেরল। লিঙ্কনকে যারা চেনে তারা অনেকেই এক দৃষ্টে তাকে দেখতে লাগল। কেউ কাছে এল না।

লিঙ্কনের স্কুলের এক বন্ধু তার মায়ের হাত ধরে বিপরীত দিক থেকে আসছিল। তার মা লিঙ্কনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বেরনোর পর এই প্রথম একজনকে সে পেল যিনি লিঙ্কনকে এড়িয়ে গেলেন না। এতক্ষণ তার নিজেকে মনে হচ্ছিল সার্কাসের বাঘের মত। যেন সকলেই দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখছে কিন্তু কাছে আসছে না। লিঙ্কনের বন্ধুর মা লিঙ্কনকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। বহুদিন বাদে স্কুলের এক বন্ধুকে পেয়ে খুশীতে ওর মন ঝলমল করে উঠল।

সেইদিন রাত্রে লিঙ্কন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। মিলিটারির মত পোষাক পরা হাজার হাজার লোক দৌড়চ্ছে। তাদের হাতে রাইফেল, চারিদিক ধোঁয়ায় ভরে গেছে। প্রথমে সবকিছু তার অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল। পরে সে স্পষ্ট দেখতে পেল যুদ্ধ হচ্ছে! বড় বড় বাড়ী ভেঙে পড়ছে। হাজার হাজার মানুষ দৌড়চ্ছে। লিঙ্কন আরো দেখতে পেল গাড়ী গাড়ী সৈন্য একটা গ্রামে নেমে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সব কিছু দাউ দাউ করে জ্বলছে! একটা বাচ্চা ছেলের জামায় আগুন! সে কাঁদছে কিন্তু কেউ তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। সকলে দৌড়ে পালাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে লিঙ্কন মা মা মা বলে চেঁচিয়ে উঠল।

'কী হয়েছে? কী হয়েছে রে! চেঁচাচ্ছিস কেন!' বলে মা ধাক্কা দিতেই লিঙ্কন চোখ মেলে মার দিকে তাকাল। বাবাও ততক্ষণে চলে এসেছেন। কী হয়েছে! ও ভাবে তাকিয়ে আছিস কেন? বলে এক গ্লাস জল নিয়ে তিনি লিঙ্কনকে খে তবললেন।

জল খেয়ে সে কিছুটা সুস্থ হল। তারপর সে ঘুমের মধ্যে কী কী দেখেছে তা মাকে বলল। লিঙ্কন বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'যুদ্ধটা কোথায় হচ্ছিল বাবা?' লিঙ্কনের বাবা বললেন, 'এখন ঘুমোও। কাল তোমাকে সব কিছু বলব। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে', লিঙ্কন বাবার সঙ্গে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন লিঙ্কন ভুলে যায়নি আগের দিনের স্বপ্নের কথা। আর

সে স্বপ্ন ভোলার কথাও নয়। একজনকে ছুরি মারছে দেখে যে ছুটে গিয়েছিল সমস্ত বিপদ মাথায় নিয়ে। সে কী অত মানুষের মৃত্যু, ঘর বাড়ী পোড়ার দৃশ্য দেখে শান্তিতে কাটাতে পারে? বাবার কাছ থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে সবকিছু জানবার জন্য সে ছটফট করতে লাগল। সকাল থেকে বাবা কলেজে যাবার জন্য ব্যস্ত। উপরন্তু এসব জানার জন্য প্রশ্ন করলে মা রেগে যাবেন। বাধ্য হয়ে মনের ভেতরের জিজ্ঞাসা উত্তেজনা আর দুঃখ মনের ভেতরেই রেখে আলমারী থেকে বিশ্বযুদ্ধ নামের বইটা খুলল। কতকগুলো ছবির দিকে দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠল সে! এই তো সেই সব সৈনিক, কামান, রাইফেল! দলে দলে মানুষ ছুটছে! বাড়ী ঘর সব জ্বলছে! লিঙ্কন বইটা পড়তে শুরু করল।

ওর বাবা সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরলেন। টিফিন খেয়ে ছেলের কাছে গিয়ে বসলেন। বললেন, 'বিশ্বযুদ্ধের ওপর লেখা বইটা আলমারিতে ছিল। ওখানে নেই। কেউ নিশ্চয় ওটা আজ দুপুরে পড়ে ফেলেছে।'

'হ্যাঁ বাবা। আমি পড়েছি।'

'পড়ে কী বুঝলে?'

'ঠিকমত বুঝতে পারলুম না। কিন্তু জার্মানির হিটলার খুব খারাপ লোক ছিলেন, সেটা বুঝতে পেরেছি। খালি যুদ্ধ করেছে আর মানুষ মেরেছে। ঠিক বলিনি বাবা?'

বিস্ফারিত চোখে লিঙ্কনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তুই অনেক কিছুই দেখছি বুঝে গেছিস।

'না, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যুদ্ধতে এত লোক মারা যায় হিটলার, তা তো জানত তবে কেন যুদ্ধ করল?

বাবা পড়লেন মহা বিপদে কী ভাবে তিনি এত জটিল ব্যাপার ছেলেকে বোঝাবেন? অথচ ছেলে নাছোড়বান্দা। অবশেষে তিনি

যুদ্ধের ইতিহাস ছোট করে বোঝাতে লাগলেন। মানুষ যখন সভ্য হয়নি তখন খাদ্যের জন্য এবং বেঁচে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা করত। বেশীর ভাগ সময় তাকে হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হত। এর থেকে ধীরে ধীরে মানুষ বুদ্ধিমান হতে শুরু করল। সহজভাবে বেঁচে থাকার পথ আবিষ্কার করতে লাগল এবং লড়াই করার জন্য নানা রকম অস্ত্র তৈরী করতে শুরু করল। তারপর সম্পদের বা খাদ্যের মালিক হয়ে, জমির মালিক হয়ে মানুষ কী করে স্বার্থপর হল এবং স্বার্থের জন্য মানুষে মানুষে লড়াই শুরু হল, তা তিনি ছেলেকে বোঝালেন। এইভাবে বলতে বলতে শেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাও খুব ছোট এবং সহজ করে বোঝালেন।

লিঙ্কনের বাবা ইতিহাসের অধ্যাপক। তিনি মনের আনন্দে পৃথিবীর জটিল ইতিহাস ব্যাখ্যা করে গেলেন। যত সহজ করেই তিনি বলুন না কেন লিঙ্কনের তা বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সে একটু বুঝল যে যুদ্ধে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ মারা গেছে। ওর মত কত ছেলে হাত পা হারিয়ে কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছে।

স্বপ্ন দেখার পর থেকে ইদানিং সে অনেক সময়ই অন্যমনা হয়ে যায়। কিছুই যেন তার ভাল লাগে না। রাস্তার ওপর বোম, ছুরি নিয়ে লড়াই, দেশে দেশে যুদ্ধ; মানুষের কষ্ট এবং ওর নিজের সবল পা হারানো—এগুলোর মধ্যে সে একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই বয়সে তা পাওয়া সম্ভব নয় বলে মানসিক কষ্টে ছটফট করছে। অথচ ওর মনে হচ্ছে সকলে যদি রাগ, হিংসা মন থেকে ত্যাগ করতে পারে, তবে মানুষ কত আনন্দে দিন কাটাতে পারে।

লিঙ্কনের বাবা ঠিকমত বুঝতে পারছেন না যে লিঙ্কন এত কী

ভাবছে! তাই তিনি ছেলের ভাবনা কমানোর জন্য ক্যারাম লুডো ছেলের সঙ্গে খেলে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে শরৎকাল এসে গেল। আশ্বিন। মাস সেদিন এক পশলা বৃষ্টির পর লিঙ্কন জানলার ধারে এসে বসল। একবার আকাশের দিকে তাকাল। নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মত কয়েকটা মেঘের খণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছে। চারপাশ রোদ্দুরের আলোয় ঝিকমিক করছে। ফুটপাতের ওপর বসান কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা সবুজের বাহার নিয়ে যেন লিঙ্কনের দিকেই তাকিয়ে আছে। গাছটার দিকে তাকিয়ে আপন মনে সে বলে উঠল।

'তোমার চারপাশে কাঁটা তারের বেড়া লাগানো, তাও তোমার আনন্দ! তোমার তো আবার পাও নেই। চলাফেরা করতে পার না। আমিতো এখন ক্রাচটা নিয়ে একটু চলতে পারি। না: আমি আর দুঃখ করব না···।

এইসব ভাবতে ভাবতে গাছটার ফাঁক দিয়ে দূরে রাস্তার দিকে চোখ যেতেই ওর ভাবনা ছিন্ন হল। সারি দিয়ে এত লোক কোথায় যাচ্ছে? হাতে প্ল্যাকার্ড। তাদের মুখে কোন কথা নেই। সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে চলেছে।

ওর বুকের ভেতরের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল মাসী ঘরে নেই। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বগলে ক্রাচটা নিয়ে লিঙ্কন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে প্ল্যাকার্ডের লেখাগুলো সে পড়তে লাগল। 'যুদ্ধ নয়, আর যুদ্ধ নয়' মানুষ এখন শান্তিতে বাস করবে,' যুদ্ধ নয় শান্তি চাই', আমরা সব ভাই ভাই।'

লেখাগুলো পড়ে হাততালি দিয়ে উঠল। এই তো কেউ যুদ্ধ চায় না। আমার মতই গণ্ডগোল আর মারপিট আর কেউ চায় না। উত্তেজনায় সে হাঁপাতে লাগল।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে এক সময় সে মিছিলের খুব কাছে এল। মিছিলের মধ্যে ছিলেন লিঙ্কনের স্কুলের বন্ধুর মা যিনি এর আগে একদিন লিঙ্কনের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে লিঙ্কনকে কোলে তুলে নিয়ে আবার মিছিলে যোগ দিলেন। লিঙ্কন শান্তি মিছিলের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

—ঃ শেষ ঃ—